কাজের বাংলা

'আপনাকে এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা হইতেছে'-র বদলে 'আপনাকে জানানো হচ্ছে' লিখলেই তো হয়। 'সার্টিফিকেট'-এর বিকল্প হিসেবে 'প্রমাণপত্র'ও লেখা যায়। 'ইস্যু করার বদলে 'জারি করা' বা 'লাগু করা' বলা যায় কি? 'যে কোন বা সমস্ত বিধানাবলি'-কে আরও খোলসা করে 'যে-কোনও একটি অথবা একত্রে সব কটি বিধান' লিখলে হয়তো বাংলার গা থেকে ইংরিজির গন্ধ কমানো যেত।

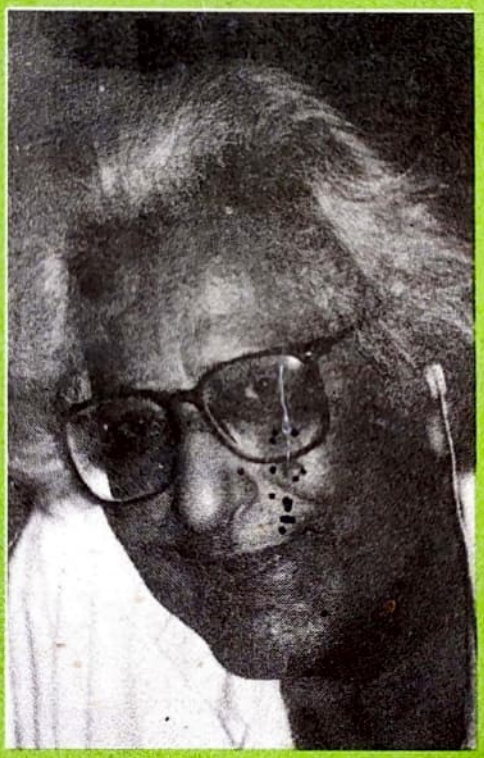

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

কাজের বাংলা

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড

KAJER BANGLA

প্রথম প্রকাশ
কলকাতা বইমেলা জানুয়ারি ২০০২.
(১১০০ কপি)

ISBN 81-86891-34-X

প্রকাশক
সবাণী চক্রবর্তী
স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড
২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন
কলকাতা-৭০০ ০১৯

মুদ্রক
এস পি কমিউনিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড
২৯৪/২/১, এ পি সি রায় রোড
কলকাতা-৭০০ ০০৯

দাম ৩০ টাকা

উৎসর্গ

অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের

পাদপদ্মে

কথাচ্ছলে

'কাজের বাংলা'র জোয়ালে ঘাড় ধরে যিনি আমায় জুতে দিয়েছিলেন, তিনি প্রকাশনা, সম্পাদনা আর লেখার জগতে এক নম্বর।

শিং ভেঙে বাছুরের দলে ঢোকা যে এ বয়সে মানায় না, কথার লাঙল ঠেলতে গিয়ে হাড়ে হাড়ে আমার তা মালুম হয়েছে।

এক সময়ে বাংলায় 'গাঁতায় চাষ' বলে ভারি সুন্দর একটা প্রথা ছিল।

প্রথাটা ছিল এই:

'গ্রামের কৃষকগণ কর্তৃক কোনও নিঃস্ব বা বিপন্ন কৃষকের কাজ দলবদ্ধভাবে ও বিনা পারিশ্রমিকে সম্পাদনের রীতি'। (সংসদ বাঙ্গলা অভিধান)

লেখার জগতে এমন কোনও রেওয়াজ নেই।

ফলে, রাশীকৃত বয়সে একজন উনপাঁজুরে কালা খোঁড়ার পক্ষে বেশিদূর জোয়াল টানা সম্ভব হয়নি।

কিস্তিবন্দি লেখার ঢিলেঢালা ভাবটাও বইতে খোঁচা-খোঁচা ধরন নিয়ে থেকে গেল।

এ লেখায় আমাকে আগাগোড়া উৎসাহ দিয়েছেন গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর স্নেহাস্পদ প্রণব বিশ্বাস। নইলে নৌকোয় জল উঠছে দেখে অনেক আগেই হাল ছেড়ে দিতাম।

'কর্মক্ষেত্র'র কাছে আমার ঋণ কথায় শোধ হওয়ার নয়।

৫/১/২০০২

বিনীত

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গ সরকার বহুদিন ধরে বাংলা ভাষায় সরকারি কাজকর্ম চালাবার সদিচ্ছা ঘোষণা করেছেন। সেই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য শুধু বাংলা টাইপিস্ট, বাংলা স্টেনো হলেই চলবে না, তার চেয়ে বেশি দরকার কাজকর্মের উপযোগী বাংলা ভাষা রপ্ত করা। দরকার কাজের বাংলা। যাঁরা সরকারি কাজে রয়েছেন, যাঁরা সরকারি চাকরি করার চেষ্টা করছেন বা দূর-অদূর ভবিষ্যতে সরকারি চাকরির জন্যই প্রস্তুত হচ্ছেন, তাঁদের সকলের পক্ষে দরকার কাজের বাংলা রপ্ত করা। 'কাজের বাংলা' ধারাবাহিকভাবে 'কর্মক্ষেত্র' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এবার, গ্রন্থাকারে।

জ্ঞানপীঠ, সাহিত্য আকাদেমি প্রভৃতি বহু পুরস্কারে সম্মানিত বাংলা ভাষার প্রবাদপ্রতিম কবির বাংলা শেখার এই আসরে সব বয়সের বাঙালীর নিমন্ত্রণ। কাজে লাগলে, আনন্দের হলে আমাদেরও আনন্দের শেষ থাকে না। অনুরোধে মুখ খোলায় এই বাংলা-কথকের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতাও অশেষ।

১৫ জানুয়ারি, ২০০২

প্রধান সম্পাদক, কর্মক্ষেত্র

কথা দিয়ে কথা রাখা

হাতে একটা কোদাল ধরিয়ে দিয়ে এডিটর হাওয়া।
এদিকে পায়ের নিচে জমি খুঁজে পাচ্ছি না যে চাষ করব।
মেঘে মেঘে স্বাধীনতার বেলা কম হল না। অথচ মুখের কথা আজও মুখেই থেকে গেল।
দু-দশ বছর বাদে বাদে টনক নড়ে। ফতোয়া জারি হয়। তারপর আবার যে কে সেই। নতুন নতুন ফাইলের তলায় সব চাপা পড়ে যায়।
কেন আমরা কথা রাখতে পারছি না?
নিজেদের বুকে হাত রাখলেই আমরা তা টের পাব।
যারা ইংরিজিনবিশ, কাজের ভাষা বাংলা না হলেও তাদের কিছু যায় আসে না। ইংরিজি-না-জানা লোকদের পরমুখাপেক্ষী হওয়া ছাড়া উপায় নেই। এরাই হল রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ। এদেরই ভোটে একদল লোক ক্ষমতা হাতে পায়। আজও মধ্যস্বত্বভোগীদেরই পোয়াবারো।
শাসকদের মনের কোঠায় এই ইংরিজি না-জানা মানুষেরা ঠাঁই পায় না। ফলে, পরভাষাকে আপন করে বহালতবিয়তে দিন চলে যায়। আর এই ভাষার জন্যেই ঘরের মানুষকে হতে হয় পরের দোর-ধরা। এমনকী সাক্ষরতার হার বাড়লেও অবস্থার খুব একটা হেরফের হয় না।
কথা দিয়েও কথা না রাখার জন্যে দেখা যায় না ওপরওয়ালাদের মধ্যে কোনও অপরাধবোধ।
ওপরকার নিভে-যাওয়া এই আঁচটাকে নিচে থেকে খুঁচিয়ে গনগনে করার কাজটাকেই বোধহয় হাতে নিয়েছে 'কর্মক্ষেত্র'।

এদিকে ডাঙায় দাঁড়ানো আমাকে আচমকা ঠেলে জলে ফেলে দিয়েছেন সম্পাদক। হয়তো এই ভেবে যে, সাঁতার শেখার এটাই একমাত্র উপায়। জলে ভেসে থাকার দায়ে পরিত্রাহি হাতপা ছুঁড়তে ছুঁড়তে বিদ্যাসাগরের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বলা কথাগুলো আমি যতদূর পারি মনে রাখার চেষ্টা করব:

'... আমরা আরম্ভ করি, শেষ করি না; আড়ম্বর করি, কাজ করি না; যাহা অনুষ্ঠান করি তাহা বিশ্বাস করি না; যাহা বিশ্বাস করি তাহা পালন করি না; ভূরি পরিমাণ বাক্য রচনা করিতে পারি, তিল পরিমাণ আত্মত্যাগ করিতে পারি না; আমরা অহঙ্কার দেখাইয়া পরিতৃপ্ত থাকি, যোগ্যতা লাভের চেষ্টা করি না; আমরা সকল কাজেই পরের প্রত্যাশা করি, অথচ পরের ত্রুটি লইয়া আকাশ বিদীর্ণ করিতে থাকি; পরের অনুকরণে আমাদের গর্ব। পরের অনুগ্রহে আমাদের সম্মান, পরের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া আমাদের পলিটিক্স, এবং নিজের বাক্‌চাতুর্যে নিজের প্রতি ভক্তিবিহ্বল হইয়া উঠাই আমাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। এই দুর্বল, ক্ষুদ্র, হৃদয়হীন, কর্মহীন, দাম্ভিক, তার্কিক জাতির প্রতি বিদ্যাসাগরের এক সুগভীর ধিক্কার ছিল। ...'

দশে মিলে

অনেক মাথা যাতে এক করা যায়, তার জন্যে 'কর্মক্ষেত্র'র পাতায় এটা হবে বটতলার একটা খোলা আসর। যে কারও মুখ খুলতে এখানে বাধা নেই। সরকারি কাজে বাংলা ভাষার সহজ আর স্বচ্ছন্দ প্রয়োগ— এটাই হবে এই দপ্তরের উদ্দেশ্য। অভিজ্ঞ পাঠকেরা সাগ্রহে এতে যোগ দিলে তবেই আমরা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারব।

এ কাজে কিছু কিছু পরিভাষারও দরকার হবে।

দেশী আর বিদেশী তৎসম আর তদ্‌ভব শব্দের ভাঁড়ার থেকে অনেক কিছুই আমরা পেয়ে যাব। দেখতে হবে যেন তা আমাদের মুখে মানিয়ে যায়।

পরাধীন আমলের যে আত্মবিস্মৃতিতে আজও আমরা ভুগছি, তা না কাটালেই নয়। জ্ঞানবিজ্ঞানে আমাদের জাতীয় ঐতিহ্য বিপুল। সেই বনেদি সিন্দুক থেকে বার করে এনে অনেক শব্দই আমরা নতুন করে ঝালিয়ে নিতে পারি। কখনও তৎসম, কখনও তদ্‌ভব রূপে। বিদেশী শব্দের আত্মীকরণও হবে এই একই প্রক্রিয়ায়।

কেতাবি শব্দের বাইরেও হাটে-বাজারে কারিগর আর ব্যাপারীদের অজস্র আটপৌরে শব্দ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে— এ কাজে যা আমাদের সম্পদ হতে পারে।

পাঠকদের কাছে করজোড়ে আবেদন, যেন তাঁরা পারলে এইসব শব্দ কুড়িয়ে বাড়িয়ে আমাদের এই আসরে পেশ করেন।

অলমতিবিস্তরেণ।

'কাজের বাংলা'র এই পাঠশালার মূল লক্ষ্য হবে কাজের কথা বলতে শেখা। দ্ব্যর্থকতা এড়িয়ে সরল ভাষায় মনের ভাব সরাসরি পৌঁছে দেওয়া। প্রশাসন আর প্রজার মধ্যে সেতু বাঁধতে পারে কেবল মাতৃভাষা। নইলে মোরা রাজার সনে মিলব কী শর্তে।

ঘোড়া আগে, চাবুক পরে

কিছু পুরোনো কথা ঝালিয়ে নেওয়া যাক।

স্বাধীনতা হওয়ার পরে পরেই এ রাজ্যের সরকার বড় গলায় প্রায় ধনুর্ভঙ্গ পণ করেছিল যে, রাজ্যের কাজ বাংলাভাষায় হবে। তার জন্যে তোড়জোড়ও শুরু হয়।

এরপর নানা কালপর্বে যথাক্রমে রাজশেখর বসু, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় আর সুকুমার সেনকে সভাপতি করে যে পরিভাষা সমিতি গড়ে ওঠে, তা একুশ বছর চেষ্টা করে ছ দফায় তার সুপারিশ প্রকাশ করে।

ইংরেজদের দখলদারিতেই যখন এক সময়ে মাতৃভাষাকে উচ্চশিক্ষার বাহন করার দাবি উঠেছিল, তখন একদল এই বলে তাকে ধামাচাপা দিতে চেয়েছিল যে, আগে বাংলায় উচ্চশিক্ষার বই লেখা হোক, তারপর ওসব ভাবনা ভাবা যাবে।

আগে পরে

সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'আমি জানি এই তর্ক উঠিবে, 'তুমি বাংলাভাষার যোগে উচ্চশিক্ষা দিতে চাও কিন্তু বাংলাভাষায় উঁচুদরের শিক্ষাগ্রন্থ কই?' নাই সে কথা মানি। কিন্তু শিক্ষা না চলিলে শিক্ষাগ্রন্থ হয় কী উপায়ে? শিক্ষাগ্রন্থ বাগানের গাছ নয় যে শৌখিন লোকে শখ করিয়া তার কেয়ারি করিবে, কিংবা সে আগাছাও নয় যে মাঠেবাটে নিজের পুলকে

নিজেই কণ্টকিত হইয়া উঠিবে। শিক্ষাকে যদি শিক্ষাগ্রন্থের জন্যে বসিয়া থাকিতে হয় তবে পাতার যোগাড় আগে চাই তার পরে গাছের পালা, এবং কূলের পথ চাহিয়া নদীকে মাথায় হাত দিয়া পড়িতে হইবে। ...দেশে টাকা চলিবে না অথচ টাঁকশাল চলিতেই থাকিবে, এমন আব্দার করি কোন লজ্জায়?'

অথচ শুধু একুশ নয়, চুয়ান্ন বছর ধরেই টাকা না চালিয়ে শুধু টাঁকশাল চালানোই আমাদের ব্রত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু বলতেন, 'ঘোড়া হলে চাবুকের অভাব হবে না।' রাজনীতির লোকেরা আসলে ভাষাবিদদের শিখণ্ডী করে তার আড়ালে নিজেদের গা বাঁচিয়ে এসেছেন।

যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সভাপতিত্বে 'বাংলা প্রবর্তন সমিতি' গড়ে ওঠে। সভা শোভাযাত্রা ডেপুটেশন— অনেক কিছু হয়। কিন্তু কিছুই ধোপে টেকেনি।

আমার সেই সময়কার একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি।

সে সময়কার প্রচলিত ধারণা ছিল এই যে, মাথার ওপর আমলারাই যত নষ্টের গোড়া। সরকারি কাজ বাংলায় না হওয়ার পেছ য়েছে পুরোনো কেতাদুরস্ত এদের ইংরিজিয়ানা।

আগা গোড়া

তখন তথ্যমন্ত্রী ছিলেন সোমনাথ লাহিড়ি। ওঁকে সেটা বলা হলে উনি বলেন— ওটা তো গোড়া নয়, ওটা হল আগা। যেখানে ফাইল শুরু হচ্ছে, সেইখানে এর জড়।

গেলাম করণিকের টেবিলে।

তাঁর কথা: হ্যাঁ, ফাইল ইংরিজিতেই লিখি। মুখস্থ করা ইংরিজি বাঁধা-গতে। বাংলা মাতৃভাষা হলেও, বাংলায় দু ছত্র বানিয়ে লিখতে গেলে দশবার হোঁচট খাব। তবে হ্যাঁ, বাংলায় যদি বাঁধা-গৎ থাকে, তাহলে তা মুখস্থ করে কাজ হতে পারে।

খুব সাফ কথা।

বাংলায় বাঁধাবুলি চাই।

গোড়াতেই ব্যাপারটা একটু তলিয়ে বোঝার চেষ্টা করে এ কাজে মন দিলে চুয়ান্ন বছর ধরে কেবলই ঘাস-বিচালি-ঘাস করার হাত থেকে আমরা

বাঁচতে পারতাম। সমানে হাপিত্যেশ করতে হত না।

সরকার আর পাবলিক— এই দুইয়ের যোগসূত্রই হল সরকারি কাজের বিষয়। 'পাবলিক' কথাটা বাংলায় প্রায় চলে গেছে। খবরের কাগজে লেখে 'আমজনতা'। এক সময়ে বলা হত 'আমদরবার'। এছাড়া হাতের-পাঁচ 'জনসাধারণ' তো আছেই।

যাই হোক, সরকারি কাজ এত বহুমুখী যে, তার বর্গীকরণ আমার সাধ্যায়ত্ত নয়।

পরিভাষা

এ কাজের জন্যে এ পর্যন্ত যেসব বইপত্র জোগাড় করতে পেরেছি। তা এই :

১। ভারত সরকার প্রকাশিত Consolidated Glossary of Administrative Terms (সমেকিত প্রশাসন শব্দাবলী)— ইংরিজি-হিন্দি

২। ওই— হিন্দি-ইংরিজি

৩। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রকাশিত 'পরিভাষা সংকলন'— দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০০।

৪। শব্দসন্ধান (২)— অধ্যাপক পি আচার্য। ১৯৯৯।

বাংলাদেশে বাংলায় সরকারি কাজ সংক্রান্ত বইপত্র এখনও আমি জোগাড় করে উঠতে পারিনি।

ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রকের উদ্যোগে গঠিত যে কমিশন ১ আর ২ নং বইদুটি সংকলন করেন, তার প্রথমটির মুখবন্ধে বলা হয়: এতে আছে প্রশাসন শব্দ আর পদনাম সম্বলিত ৭,৫০০ পরিভাষা, ৪২৫ বাক্যাংশ, সেইসঙ্গে ডিগ্রি, ডিপ্লোমা, সার্টিফিকেট বিষয়ক (সংক্ষিপ্ত রূপ সহ) শব্দ। এর অনেক শব্দ আঞ্চলিক ভাষাতেও গ্রহণযোগ্য হতে পারে। নতুন শব্দ গঠনের ক্ষেত্রে সংস্কৃত ছাড়াও প্রয়োজন বুঝে আঞ্চলিক ভাষার সাহায্য এবং বাজারচলতি শব্দ গ্রহণ করা হয়েছে। শব্দের যাথার্থ্য ক্ষুণ্ণ না করে, সরকারি ভাষাকে আগাগোড়া সহজ সরল করার চেষ্টা হয়েছে।

স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন পর্যায়ের পরিভাষা সংসদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন: রাজশেখর বসু, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার সেন, রমেশচন্দ্র মজুমদার, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, নির্মলকুমার বসু, শশিভূষণ দাসগুপ্ত, সজনীকান্ত দাস, প্রমথনাথ বিশী, দুর্গামোহন ভট্টাচার্য, জানকীবল্লভ

ভট্টাচার্য, পতঞ্জলি ভট্টাচার্য, সুরেশচন্দ্র মজুমদার, হরপ্রসাদ মিত্র প্রভৃতি।
'পরিভাষা সংকলনে'র দ্বিতীয় সংস্করণে বলা হয়েছে:
'প্রায় অর্ধ শতাব্দী আগে রচিত পারিভাষিক শব্দগুলি ব্যবহার করতে গিয়ে যেসব অসুবিধা দেখা গিয়েছিল তা দূর করার জন্যে সংকলনটি পরিমার্জনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। রাজ্য সরকার পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমিকে এই পরিমার্জনার দায়িত্ব অর্পণ করেন।
'পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি সানন্দে এই দায়িত্ব গ্রহণ করে। আকাদেমি বিভিন্ন শিক্ষাবিদ, ভাষাতাত্ত্বিক, সাংবাদিক, সরকারি প্রশাসক ও আইনজ্ঞদের নিয়ে একটি উপসমিতি গঠন করে তাঁদের হাতে এই পরিমার্জনার দায়িত্ব অর্পণ করে। এই উপসমিতি দীর্ঘদিন আলোচনার পর তাঁদের সুপারিশ পেশ করেন। তারই ফলস্বরূপ এই পরিমার্জিত সংস্করণ। ...'
কেন্দ্রে ছাড়াও কয়েকটি রাজ্যে সরকারি কাজ প্রধানত হিন্দিনির্ভর। অর্ধশতাধিক বছরে সরকারি ভাষার ক্ষেত্রে এই দেশীয়করণের কাজ কতটা এগিয়েছে আমার জানা নেই। 'কর্মক্ষেত্র'র হিন্দি জানা পাঠকেরা যদি এ ব্যাপারে আমাদের কিছুটা অবহিত করতে পারেন তাহলে ভালো হয়।
এ রাজ্যে বাংলায় সরকারি কাজ না এগনোর জন্যে কর্তাদের রাতের ঘুম নষ্ট.হওয়ার এখনও কোনও লক্ষণ নেই।
আমজনতার পক্ষে অবশ্য একমাত্র আশার কথা এই যে, ইলেকশন জাগ্রত দ্বারে।
এবার আরও একবার বাংলাভাষার ঢাকে কাঠি পড়বে।
ভোটপ্রার্থীদের দানপত্রে বাংলাভাষা নিয্যস্ আরেক কাঠি ওপরে উঠবে।

সাঁতার শেখা

কথার টানে কথা আসে। মনে যখন পড়লই, বলে নিই।
হচ্ছিল সাঁতারের কথা।
ছেলেবেলায় কালীবাড়ির মাঠে যিনি আমাদের লাঠিখেলা ছোরাখেলা শেখাতেন, তিনি ছিলেন শহরে নবাগত এক কমবয়সী টোলের পণ্ডিত।
আমাদের কোয়ার্টারের সামনেই ছিল সরকারি পুকুর।
আমি একদিন ঘাটের পৈঁঠে ধরে ঝাঁপাই ঝুরছি, সেই সময় সেই ছোকরা পণ্ডিত কোমরে গামছা বেঁধে এলেন পুকুরে স্নান করতে। জলে নেমে

বললেন, চলো তোমাকে পুকুরের ওপারে নিয়ে যাই। মহা উৎসাহে শক্ত করে আমি ওঁর কোমর ধরে ভেসে চললাম। জল কেটে এগোবার সে যে কী আনন্দ ভাষায় তা প্রকাশ করা যায় না।

মাঝপুকুরে গিয়ে হঠাৎ তিনি এক ঝটকায় আমার হাতদুটো ছাড়িয়ে দিয়ে একাই ওপারে চলে গেলেন। আমার তখন পড়ি-মরি অবস্থা। প্রাণ বাঁচাবার জন্যে মরিয়া হয়ে জল খেতে খেতে কীভাবে যে সেদিন ওপারে পৌঁছেছিলাম, ভাবলে আজও গায়ে কাঁটা দেয়। সেই মুহূর্তে টুলো পণ্ডিতমশাইকে মনে হয়েছিল যেন সাক্ষাৎ যমদূত।

কিন্তু ওই আপাতনিষ্ঠুর প্রক্রিয়াতে একদিনেই আমার সাঁতার শেখা হয়ে গেল। আর সেই টুলো পণ্ডিতের কাছে আমি চিরদিনের মতো ঋণী রয়ে গেলাম। গল্পটা যে সাদাসিধে নয়, এর শেষটা বললে বুঝতে পারবেন।

এর কদিন পরেই শহর জুড়ে হৈ চৈ।

কী ব্যাপার?

টোলে শেষরাতে বিরাট এক পুলিশবাহিনী হানা দেয়। কিন্তু তার আগেই সেই ছোকরা পণ্ডিত হাওয়া।

পরে জানা গেল, আসলে উনি ছিলেন ছদ্মনামে এক আত্মগোপনকারী স্বদেশী বিপ্লবী। ধরতে পারলে যাঁর ফাঁসি হবে।

সাঁতারের কথা উঠলে আজও সেই কদমছাঁটা চুলের গাঁট্টাগোঁট্টা মানুষটাকে আমার মনে না হয়ে পারে না।

কাজের কাজ

গল্প ছেড়ে এবার কাজের কথায় আসা যাক।

মাকড়সার জাল বোনাকে আমরা কাজ বলে ধরি না। কেননা তাতে ভাবনাচিন্তার বালাই নেই।

মানুষ আগে মনে মনে ছকে নেয় কী করবে। তারপর খেটেখুটে তার ইচ্ছেটাকে কাজে ফলায়।

একজন তাঁতির কথা ধরা যাক।

গোড়াতেই সে ধরে নেয় কাপড় বুনবে। শুধু কাপড় বোনার মুরদ থাকলেই তো হবে না। তাঁত চাই, সুতো চাই। চুপচাপ বসে থাকা চলবে না। কাজ শুরু করতে হবে। শেষও করতে হবে। আগাগোড়া টানাপোড়েনের ভেতর দিয়ে তার কর্মফল ফুটিয়ে তুলতে হবে। তরতরিয়ে কাজ এগোবে যদি কাজে

আনন্দ থাকে। নইলে কাজ হবে খাপছাড়া আর দায়সারা। কাজে প্রেরণা না থাকলে যা হয়। অতএব কাজ হওয়া চাই মনের মতো। কাজ আর তখন নিছক কাজ থাকে না। হয় কারুশিল্প।

সরকারি কাজ বলতে শুধু যে গভর্মেন্টের কাজই বোঝায় তা নয়। 'সরকারি'র আরেক অর্থ 'সর্বসাধারণ'। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানেরও এমন অনেক কাজ আছে। যার সঙ্গে যুক্ত রাজ্যের সর্বসাধারণ। সেসব ক্ষেত্রে বাংলাভাষার ব্যবহারই প্রশস্ত।

রাস্তায় বেরোলে প্রায়ই দেখা যায় একটা করে চিহ্ন খাড়া করা আছে— 'রাস্তা বন্ধ' কিংবা 'কাজ চলছে'। অবশ্যই ইংরিজিতে।

স্বাধীনতা ইস্তক আমরা দেখে আসছি সরকারি কাজ থকে যাওয়ার বাবদে এই রকমের কয়েকটি প্রতিবন্ধক। 'পরিভাষা নেই' কিংবা 'পরিভাষা তৈরি হচ্ছে'। অর্থাৎ পরিভাষার ওজর তুলে বাংলাভাষাকে ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা।

বার বার কেঁচেগণ্ডুষ করতে গিয়ে বাংলাভাষার কাজ শেষ পর্যন্ত লাটে উঠেছে। এটা যেন মনে থাকে।

সাধারণত একই শব্দ নানা অর্থে কিংবা একাধিক শব্দ একই অর্থে আমরা ব্যবহার করে থাকি। এতে ভাষা খোলতাই হয়, কথায় রস পাওয়া যায়। সেক্ষেত্রে পরিভাষার থাকে বাঁধাধরা নির্দিষ্ট অর্থ। পরিভাষাটি দেখতে শুনতে যেমনই হোক, কাজে লাগাটাই হবে তার আসল মাপকাঠি।

পরিভাষার ক্ষেত্রে আরও একটা কথা মাথায় রাখা দরকার। যাকে আমরা নিছক কেজো বলে দুরে ঠেলি, কাজে লাগাতে লাগাতে কখন যে আমরা তার হাতধরা হয়ে পড়ি, অনেক সময় সেটা খেয়াল থাকে না। তখন মাথার জিনিস বুকে এসে ঠাঁই নেয়।

যেমন, লোকগীতিতে শুধুই কি আর ফুল, চাঁদ আর দোয়েল-কোয়েল্‌ই থাকে? সুরের হাত ধরে চলে আসে ইস্টিশান, হেডমাস্টার, বিজলিবাতি আর কারখানার ভোঁ।

কাজেই পরিভাষা পারতপক্ষে এমন হলে ভালো হয়, যা সময়ের সঙ্গে সর্বঘটে তাল দিয়ে চলতে পারবে।

গণতন্ত্রের তোলাউপুড়

এবার দেখা যাক সরকারি কাজের ধরনগুলো কেমন।

একদিকে সরকারপক্ষের জনসংযোগের কাজ। চলাচলের রাস্তায়,

ফেরিঘাটে, ইস্টিশানে, হাটেবন্দরে দেয়ালে কিংবা গাছের গায়ে লটকানো ছোটবড় নোটিশ আর বিজ্ঞপ্তি।

'এতদ্বারা জানানো যাইতেছে ...' দিয়ে শুরু। 'অনুমত্যনুসারে' দিয়ে ইতি টানা।

সাবেকের এই বাঁধা গৎ, দুঃখের বিষয়, আজও বলবৎ।

বাংলায় সাধুরীতির গদ্য একমাত্র আনন্দবাজার সম্পাদকীয় স্তম্ভে ছাড়া আজ আর বড় একটা চোখে পড়ে না। তাও এই রক্ষণশীলতা কোনওরকমে শুধু ক্রিয়াপদেই আটকে আছে।

আমাদের ছেলেবেলায় 'হইবেক', 'করিবেক', 'বসিবেক', আকছার লেখা হত। আশা করি, রেলের কামরা থেকেও এখন তার পাট উঠে গেছে।

দেশভাগের আগে সাধুরীতির গদ্যের স্বপক্ষে এই যুক্তি দেখানো হত যে, পূর্ববঙ্গের কাছে শান্তিপুর-কলকাতার কথ্যরীতি তেমন বোধগম্য নয়।

আজ আর এ যুক্তি খাটে না। শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাভাষায় আঞ্চলিকতার বেড়াগুলো এমনভাবে ভেঙে যাচ্ছে যে, বাংলাদেশেও কলকাতার মুখের ভাষা সাহিত্যে আজ একচ্ছত্র হয়ে উঠেছে।

সরকারি কাজের বাংলা হবে সাধারণ মানুষের মুখের কথার কাছাকাছি— এটাই হওয়া উচিত সরকারের ঘোষিত ভাষানীতি।

এখন যে আর রাজাপ্রজা বলে কিছু নেই, এটা ভালো করে বুঝে নিয়ে লেখার পুরোনো ঢংগুলোও বদলাতে হবে।

'মহামান্য সরকার বাহাদুর'।

'শতকোটি প্রণামান্তে', 'আপনার সেবানুদাস', 'অনুগত বশম্বদ'— এসব ছেঁদো কথা বিলকুল বরবাদ।

কিন্তু আদবকায়দা আর শিষ্টাচার? অবশ্যই বজায় থাকবে।

'যথাবিহিত সম্মানপুরঃসর'!

কিন্তু কী দরকার অত ঘুরিয়ে নাক দেখানোর।

'শ্রী অমুক বরাবরে' কিংবা 'শ্রী অমুক-সমীপে'-র পর 'সবিনয় নিবেদন'ই তো যথেষ্ট। আর ইতি-র পর 'ভবদীয়'। খুবই ভদ্রোচিত নয় কি?

বাংলায় 'ভড়ং' বলে একটা কথা আছে। 'ভড়ং' ছিল এক সময়ে খুবই জোরালো যুদ্ধাস্ত্র। পরে সেটা হয়ে যায় একেবারেই ফালতু।

কাজেই ওসব সেকেলে ভড়ঙের আজ আর দরকারটা কী?

হাতেকলমে

শতং বদ, মা লিখ।

এটা বলার একটাই কারণ। মুখের কথা বললেই ফুরিয়ে যায়। তার কোনও প্রমাণ থাকে না।

আজকাল অবশ্য টেপরেকর্ডার হয়ে কথা বলার দায় এড়ানো সব সময় সহজ হয় না।

মুখে বলার সুবিধে যেমন, তেমনই অসুবিধেও কম নয়। একবার মুখ থেকে বেরিয়ে গেলে তা আর ফেরানো যায় না।

লেখবার সময় আমরা ঠান্ডা মাথায় মেপে মেপে শব্দ ব্যবহার করতে পারি। ঠিক মনের মতো না হলে অনায়াসে কাটাকুটি করতে পারি।

লিখতে যাঁরা ভয় পান, তাঁরা কলম হাতে নিয়ে দু-চারদিন অভ্যেস করলেই বুঝবেন লেখার কাজটা এমন কিছু হাতিঘোড়া ব্যাপার নয়। লেখা বলতে, মুখের কথাকেই লিপিবদ্ধ করা।

তবে বলা আর লেখার মধ্যে কিছু তফাৎ থাকেই। বলার সময় আমাদের কথায় অনেক ফাঁক থেকে যায়। অনেক কথা কেবল চোখ-মুখ কিংবা হাত-পা নেড়ে, কখনও বা গলার স্বরে ঠারে ঠোরে বুঝিয়ে দেওয়া হয়।

কিন্তু লেখার সময় আগাগোড়া কথা দিয়ে এই ফাঁকগুলো ভরে দিতে হয়।

মুখে বলা আর লিখে বলা— দুইয়েরই থাকে নানা রকমফের।

আপনজনের সঙ্গে যত স্বচ্ছন্দে কথা বলা যায়, বাইরের লোকের সঙ্গে ঠিক ততটা অন্তরঙ্গভাবে কথা বলা যায় না। যাতে বেফাঁস কিছু বলে না ফেলি, সেদিকে খেয়াল রাখতে হয়।

ব্যক্তিগত চিঠি আর সরকারি চিঠির মধ্যে আকাশপাতাল ফারাক হয়। তাই যাকে লিখছি তার সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক, তারই ওপর আমার লেখার ঢং নির্ভর করে।

লেখার ভোলবদল

নিরক্ষর বেশি বলে এদেশে লেখকদের বরাবরই খাতির বেশি। কায়স্থ আর মুনশিদের লেখাই ছিল পেশা। আজও তাই রেজিস্ট্রি অফিসে আর ডাকঘরে দলিললেখক আর মনি অর্ডারের কলমচিদের এত কদর।

'শতং বদ, মা লিখ'— এই আপ্তবাক্যটি এদের খুব পছন্দ। সযত্নে এরা

লেখার প্যাঁচ-পয়জারগুলো সবিস্তারে বাঁচিয়ে রাখে। রাজদরবারে লেখা পুরোনো চিঠিপত্রগুলো দেখলে বোঝা যায় কর্তাভজার ব্যাপারটা কী পর্যায়ে যেতে পারে। রাজা আর প্রজা— দু-তরফেই বিশেষণের কী ঘটাপটা! মহাজনেরা সব ভগবানের অবতার আর দীনজনেরা নরকের কীট।

আজ যখন অফিসে কাছারিতে ইংরিজির বদলে বাংলা লেখার তোড়জোড় চলেছে, তখন হাটবাজারের এই পেশাদার বাংলা-লিখিয়েদের দিকেও বিশেষ নজর দেওয়া উচিত। এঁদের যেমন নয়া তালিমের দরকার, তেমনই এই কলমবাজ জনগণেশদের কাছ থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখবারও আছে।

এই গণলেখকদের সঙ্গে হাটবাজারের প্রত্যক্ষ যোগ। সেখানকার নিত্যব্যবহার্য অনেক শব্দ কুড়িয়ে এনে বাংলাভাষার প্রকাশক্ষমতা তাঁরা বহুগুণ বাড়াতে পারেন।

স্বদেশী আর স্বভাষা— এক সময়ে ছিল এ দুইয়ের ওতপ্রোত যোগ। তারই ফলে বাংলাভাষাকে শিক্ষার বাহন করার জোরালো দাবি উঠেছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পরিভাষা তৈরির কাজে মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছিল। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় শুরু হয়েছিল মিস্ত্রিকারিগরদের ব্যবহৃত শব্দসংগ্রহের কাজ। আলাদা একটি পত্রিকা বেরিয়েছিল, তার নাম 'কাজের লোক'।

'আমরা আরম্ভ করি, কিন্তু শেষ করি না'— রবীন্দ্রনাথের এই খেদ মর্মান্তিক হলেও ষোলআনা সত্যি।

নইলে স্বাধীনতার বছর কুড়ি-পঁচিশ আগেই স্বদেশী সেই ভাবের জোয়ারে হঠাৎ এমনভাবে ভাঁটা পড়ল কেন?

কেনইবা থেকে থেকে আমাদের সংকল্পে ছেদ পড়ে?

নাকি বাংলা শুধু বাবুগিরি করার ভাষা, তার ভারী বোঝা বওয়ার ক্ষমতা নেই!

কোনও মানবশিশুকে আজন্ম অন্ধকার ঘরে বন্দী করে রাখলে সে নির্ঘাত হবে ঠুঁটো-জগন্নাথ। চোখ থেকেও সে হবে কানা, কান থেকেও সে হবে কালা, মুখ থেকেও হবে বোবা। যেমন, হাততোলা ঊর্ধ্ববাহু সন্ন্যাসী পরে আর তার হাত নড়াতে পারে না।

কোনও ভাষাকে কাজে লাগালে তবেই সে ভাষা কাজের হয়। কাজে না লাগানোর ফলেই পৃথিবীর অনেক ভাষা লুপ্ত হয়ে গেছে।

কাজেই বাংলাভাষার বাঁচা-মরা নির্ভর করছে আমরা তাকে কাজে লাগাতে পারছি কি পারছি না তার ওপর।

বিশ্বজগৎকে দেখেশুনে চোখেকানে ফুটিয়ে তোলাই হল ভাষার কাজ। কথা হল সবাকচিত্র। আওয়াজ শুনে মনশ্চক্ষে তা দেখতে পাই।

পদার্থকে ভাঙতে ভাঙতে শেষ যেখানে আমরা পৌঁছই, সেটা হল গতিময় বস্তু।

তেমনই ভাষাকে ভাঙতে ভাঙতে শেষ যেখানে এসে আমরা ঠেকি, সেটা হল বাক্য। একটি ক্রিয়াযুক্ত নামপদ। একটি বিশেষ্য বা সর্বনাম আর তার ক্রিয়াপদ।

যদিও দুটোর কম শব্দে কোনও বাক্য হয় না, তবু কখনও কখনও একটি শব্দ দিয়েও কোনও কোনও ভাব আমরা প্রকাশ করে থাকি।

ঘরে সবাই বসে আছে। জানলা দিয়ে তাকিয়ে কেউ বলে উঠল, 'বৃষ্টি'। শুনেই তাড়াতাড়ি একজন ছুটে গেল দড়িতে শুকোতে দেওয়া কাপড় তুলতে। 'বৃষ্টি' বলার মধ্যেই উহ্য হয়ে ছিল 'পড়ছে' কথাটা। তাই একটি শব্দেই পুরো একটি বাক্য গড়ে উঠেছিল।

ব্যাকরণে এই দুটি শব্দের একটি হল উদ্দেশ্য, অন্যটি বিধেয়। বাক্য এ দুইয়ের যোগফল।

বাক্যের ঘাড়ে বেশি শব্দের বোঝা চাপালে পাঠকের বাঁশবনে ডোমকানা হওয়ার ভয় বাড়ে। পারতপক্ষে জটিল বাক্য এড়িয়ে চলা ভালো।

সহজ মানে দুধে জল মেশানো নয়।

সেকেলে যন্ত্র আর আজকের যন্ত্রের মধ্যে কত তফাৎ। আগে ছিল সব ঢাউস ঢাউস কলকব্জা। তার কত রকমের ফ্যাঁকড়া।

হালআমলের যন্ত্রগুলো আকারে ছোট। তার সহজ সরল কাঠামোর পিছনে রয়েছে আগের চেয়ে আরও এককাঠি জটিল প্রযুক্তি।

কাজেই মনে রাখতে হবে, 'সহজ কথা যায় না বলা সহজে'।

সরলতার দিকে যেন ফেরানো থাকে জটিলতার মুখ।

অন্য একটি জরুরি কথা বলে এবার এ প্রসঙ্গের ছেদ টানব।

ভাষানীতি

বহু ভাষাভাষীর দেশ আমাদের এই ভারত। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী পার হয়েও জাতীয়স্তরে আজও কোনও সুস্পষ্ট ভাষানীতি তৈরি হয়নি।

এর ফলে, শুধু গণতন্ত্র নয়, মানবাধিকারও যে ক্ষুণ্ণ হচ্ছে, সে বিষয়ে কোনও মহলে কোনও উচ্চবাচ্য নেই।

রাষ্ট্রপতি, কেন্দ্রীয় বা অন্য রাজ্যের সরকারের কাছে কেন আমি মাতৃভাষায় আমার কোনও বক্তব্য জানাতে পারব না?

কেন্দ্রে কেন বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদের একটি আলাদা দপ্তর থাকবে না? রাজ্যস্তরেই বা থাকবে না কেন?

কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের এবং সেইসঙ্গে এক রাজ্যের সঙ্গে অন্য রাজ্যের যোগসূত্রকে জোরালো করে তুলতে অবিলম্বে অনুবাদকদের নিয়ে আলাদা একটি সার্ভিস গড়ে তোলা হোক।

মাছিমারা কেরানি কমিয়ে নতুন সহস্রাব্দে মস্তিষ্কবান অনুবাদক বাহিনী দলে ভারী হোক।

নিজের পায়ে দাঁড়ানো

ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি। আমার অবস্থা হয়েছে এখন তাই।

কাঁহাতক আর একা একা দেওয়ালের সঙ্গে কথা বলা যায়?

আন্দাজে ঢিল মেরে চলেছি। কারও গায়ে লাগলে নিঃসন্দেহে টের পেতাম। ভয় পাচ্ছি, আসর ফাঁকা নয় তো?

সম্পাদক অবশ্য হাল ছাড়তে নারাজ। বলছেন, সবুরে মেওয়া ফলে। নিজে কর্মবীর, তাই যার ঢাল-নেই তরোয়াল-নেই, তাকে এ কথা বলার তাঁর হক আছে।

আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে যখন প্রথম কায়রোয় যাই, মিশরের প্রেসিডেন্ট তখন নাসের। ফরাসিদের সরিয়ে দিয়ে মিশরীরা সে সময়ে স্বহস্তে সুয়েজ খালের ভার নিয়েছে। পশ্চিমের সাহেবরা শোরগোল তুলল— দেশোয়ালিদের হাতে পড়ে এবার সুয়েজের দফা রফা হবে। সাহেবদের টেক্কা দিয়ে মিশর সেদিন মুখের মতো জবাব দিয়েছিল।

সেইসঙ্গে খুলে ফেলেছিল বিদেশী ভাষার শেকল।

নাসেরের মন্ত্রিসভায় যাঁর ওপর দেশীভাষা প্রবর্তনের ভার পড়েছিল, তিনি ছিলেন আরবী ভাষার একজন গণ্যমান্য অধ্যাপক। ওঁর স্ত্রী ছিলেন সেবারের আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলনে আমাদের ভারতীয় দলের দোভাষী। সেই সূত্রে ওঁদের বাড়িতে খেতে গিয়ে অধ্যাপকের সঙ্গে শিক্ষা

আর কাজের ক্ষেত্রে ভাষান্তর প্রসঙ্গে কিছু সমস্যার কথা জেনেছিলাম। উনি বলেছিলেন: ভাষার ক্ষেত্রে আমাদের হতে হবে স্বনির্ভর। দরকার মতো বিদেশী শব্দ নেব। কিন্তু আরবী ভাষার স্বভাবের সঙ্গে যাতে তা খাপ খায় এমনভাবে। অনুবাদের ভাষা হলে চলবে না। ওপরতলার কিছু লোকের মধ্যে আছে ফরাসিভাষাকে বড় বেশি মাথায় তোলার ভাব। এই হীনম্মন্যতা দূর করতে হবে।

স্বাধীন হওয়ার পর ভিয়েতনামেরও ছিল এই একই সমস্যা। ফরাসিভাষার বন্ধনদশা থেকে নিজেদের মাতৃভাষাকে মুক্ত করা।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা মাথায় রাখা ভালো। লিপি আর ভাষার মধ্যে সম্পর্কটা হল পাতানো। লিপি হল ধ্বনির রেখাচিত্র।

ইংরিজি, ফরাসি, জার্মান, ইতালিয়ান, পোলিশ, চেক, হাঙ্গেরিয়ান, রোমানী, স্প্যানিশ— ভাষা আলাদা হলেও এদের লিপি এক। আবার আলাদা জাতের ভাষা হয়েও এই রোমান লিপিকেই নিজের করে নিয়েছে তুরস্ক, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম।

অক্ষর এক হলেও, একেক ভাষায় তার উচ্চারণের ধরন আলাদা। সেসব ভাষা পড়তে গেলে কেবল অক্ষরজ্ঞান থাকলেই হয় না। ভাষাজ্ঞানের দরকার হয়। অসমিয়া, বাংলা, মৈথিলি, মণিপুরি বিষ্ণুপ্রিয়ার লিপি এক হলেও উচ্চারণগত পার্থক্য আছে।

লিপির সঙ্গে ভাষার সম্পর্কটা পাতানো হলেও এক সময়ে দুটো প্রায় একাত্ম হয়ে ওঠে।

দেশভাগের পর পশ্চিম পাকিস্তানীরা চেয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের মুখের ভাষা কেড়ে নিয়ে উর্দুকে রাজভাষা করতে। না পেরে শেষ পর্যন্ত উর্দু হরফে বাংলা লেখার বায়না ধরে। তাদের সে সাধে বাধ সেধেছিল বাঙালির জাতীয়তাবাদ। ভাষার হাত ধরে জান কবুল করে গড়ে উঠেছিল স্বাধীন বাংলাদেশ।

অন্যদিকে, বাংলাভাষাকে সহজসাধ্য করার লক্ষ্যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে একদল বাঙালি মনীষী রোমান হরফে বাংলা লেখার রব তুলেছিলেন। লিপির প্রতি মমত্ববোধের দরুন বাঙালি সে ডাকে সাড়া দেয়নি। আবেগের কাছে যুক্তি টেকেনি।

লিপির প্রশ্নটা আপাতত ধামাচাপা পড়লেও, তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে মাঝে মাঝেই বোধহয় আমাদের তা চিন্তায় ফেলবে।

একটা আশার কথা কানে এল। পশ্চিমবঙ্গের সদর দপ্তরে নাকি বাংলায় সরকারি কাজ চালু হয়ে গেছে।

এর চেয়ে ভালো খবর আর হয় না। খবরের কাগজে আমরা চাই এই অভিযানের ধারাবাহিক বিবরণ। একই সঙ্গে চাই বাধাবিঘ্ন আর মুশকিল আশানের বৃত্তান্ত।

পরিভাষা নিয়ে মুখ খোলবার আগে আজকের এক নতুন বুকনি— 'কর্ম-সংস্কৃতি'— সম্বন্ধে দুচার কথা বলে নিতে চাই।

আদতে এ সবই ইংরিজির পেট থেকে পড়া বাংলা শব্দ। কাজে নিষ্ঠা আনতে গেলে পরের মুখে ঝাল না খেয়ে কি আমাদের উপায় নেই?

এমন নয় যে কস্মিনকালে আমরা কাজ করিনি। তবু আজ যখন জাত তুলে কেউ আমাদের ফাঁকিবাজ বলে, আমাদের প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর কেমন যেন ক্ষীণ শোনায়।

আজও আমাদের সমাজের গোড়ায় এমন সব গলদ রয়ে গেছে, যার ফলে কাজের মধ্যে না থাকে স্ফূর্তি, না থাকে প্রাণ। খেয়ে-পরে প্রাণ বাঁচাতে আমরা যেন নেহাৎ ঠেলায় পড়ে কাজ করি।

এমন দিন নিশ্চয় আসবে যখন কাউকে আর ঘাড়ে জোয়াল দিয়ে কাজ করানোর ব্যাপারটা থাকবে না। মানুষ তখন সানন্দে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কাজ করবে। বেঁচে থাকা আর কাজ করার অর্থ হবে এক।

কাজ জিনিসটাকে কে কী নজরে দেখে, তারই ওপর নির্ভর করে কাজের ভালোমন্দ।

এ বিষয়ে আমার এক সময়কার এক অভিজ্ঞতার কথা বলি।

দেশ ভাগ হওয়ার আগে এ রাজ্যের কলকারখানায় বাঙালী মজুর-মিস্ত্রির সংখ্যা ছিল খুবই কম। বাপদাদাদের হাত ধরেই তারা রুজিরোজগারের রাস্তা বেছে নিত।

কাজ শেষ করে ভক্তিভরে মেশিন ঝাড়পোঁছ করে তবে তারা ঘরে ফিরত। মেশিন ছিল তাদের কাছে অন্নদাতা।

উদ্বাস্তু হওয়ার ফলে নিরুপায় হয়ে মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেরা যখন কলকারখানার শ্রমিক হতে বাধ্য হল, তখন তাদের পক্ষে এই গোত্রান্তর ভালো মনে মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি। এটাকে তারা অদৃষ্টের মার এবং অধঃপতন বলেই মনে করেছিল। ফলে তাদের সব রাগ গিয়ে পড়েছিল

মেশিনের ওপর। বড় হয়ে উঠেছিল কাজের প্রতি অশ্রদ্ধা।
জাতশ্রমিকরাও এর স্পর্শদোষ থেকে নিজেদের পুরোপুরি বাঁচাতে পারেনি। জঙ্গি শ্রমিক আন্দোলনের গোড়াপত্তনও হয় এই পর্বে।
এর আগে মনিবদের হাতে পুরোনো শ্রমিকেরা একা একা মুখ বুঁজে মার খেয়েছে। কখনওবা চোরাগোপ্তা তার বদলা নিয়েছে।
নতুন শ্রমিকেরা দেখাল শোষণের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে রুখে দাঁড়াবার রাস্তা। একদল জান যাওয়ার ভয়ে সমানে মান খোয়াত। আরেক দল ভাবত, গতরে খাটা মানেই মান খোয়ানো। কাজের ক্ষেত্রে এই দোটানা ভাব আজও রয়ে গেছে।
কাজের ক্ষেত্রে এড়ো-এড়ো ভাব থাকলে, কাজের ভাষাটাও হয় এড়ো-এড়ো। ধরি মাছ না ছুঁই পানির মতো। সরকারি কাজ মানেই দেশদশের কাজ। দেশবাসীর প্রতি মমত্ববোধ না থাকলে দায়িত্বটাকে মনে হবে যেন বিরক্তিকর বোঝা।
অফিসে নিজেদের পাওনাগণ্ডা বুঝে নিতে যাঁদের ত্বর সয় না, পরের ব্যাপারে তাঁরা হাতের কাজ ফাইলবন্দী করে দিনের পর দিন ফেলে রাখেন। 'দেখছি'। 'পরে আসুন', 'সময় লাগবে'— এসব ঠেলামারা কথা তাঁরা অবশ্য বাংলাতেই বলেন।
নিজের বেলায় আঁটিসুঁটি, পরের বেলায় দাঁত কপাটি। অফিস-কাছারিতে এটাই রেওয়াজ।
যারা সব্যসাচী, বিনা বাক্যব্যয়ে বাঁ হাতেই তারা তাদের কাজ সারে।

ঢোল শোহরত

প্রজাদের জানান দেওয়ার জন্যে সেকালে থাকত রাজাদের তাম্রশাসন কিংবা প্রস্তরলিপি। এখন তার জায়গা নিয়েছে সরকারি গেজেট, প্রেসনোট আর ভিত্তিপ্রস্তর।
আমাদের ছেলেবেলায় ছিল হাটেবাজারে ঢোলশোহরত। একজন নকিব গড়গড় করে আওড়ে যেত বাবুদের লেখা সাধুভাষায় তার মুখস্থ-করা বুলি। কখনও কখনও প্রকাশ্য স্থানে টাঙানো থাকত 'এতদ্বারা জানানো যাইতেছে' দিয়ে শুরু করে 'অনুমত্যনুসারে' দিয়ে শেষ করা ঢাউস আকারের বিবৃতি। সেদিন কৃষ্ণনগর যাওয়ার পথে ভাবছিলাম হয়তো যেতে যেতে রাস্তার

ধারে কাজের বাংলার তেমন কিছু খোরাক জুটে যাবে।

যেতে আসতে শুধু এটাই প্রমাণ হল যে, এখনও আমি মূর্খের স্বর্গে বাস করি। রেডিও, টিভি, খবরের কাগজ থাকতে সরকার কি আজও তাম্রপ্রস্তর যুগে পড়ে থাকবে?

বাড়ি ফিরে সরকারি পত্র-পত্রিকার অভাবে অগত্যা দৈনিক সংবাদপত্রের পাতা ওল্টাই:

'পশ্চিমবঙ্গ সরকার

দরপত্র

কম্পিউটার সেট ও অন্যান্য সরঞ্জাম ক্রয়ের জন্যে এস বি আই বর্ধমান-এর উপর কাটা বায়না জমা বাবদ ৫,০০০ টাকার ব্যাঙ্ক ড্রাফট/ এন এস সি/ কে ভি পি/ ট্রেড লাইসেন্স, চলতি আঃ কঃ এবং বিঃ কঃ পরিশোধের সার্টিফিকেটের কপি সহ সিল করা দরপত্র আহ্বান করা হইতেছে এবং ২৬-২-২০০১ তারিখ বেলা ১২-৩০টায় কোর্ট কম্পাউন্ডস্থিত সুপাঃ অফ পুলিস, বর্ধমান-এর অফিসে রক্ষিত টেন্ডার বক্সে উহা দাখিল করিতে হইবে। নিম্নবর্ণিতের অফিসে যে কোন কাজের দিনে অফিস চলার সময়ে ক্রয়ের বিবরণ পাওয়া যাইবে। টেন্ডার দাখিলের পূর্বে উহা সংগ্রহ করিতে হইবে।

সুপারিন্টেন্ডেন্ট অফ পুলিস,

বর্ধমান'

কিছু কথা সাঁটে লেখা সত্ত্বেও যারা বোঝবার তারা সবই বুঝতে পারবে। খুবই সহজ সরল বাংলা। লেখকের কলমের জোর আছে বোঝা যায়। আমার মতো যাদের সবকিছুতে ফোড়ন কাটা স্বভাব, তারা বলতে পারে: ভালো। তবে আরও ভালো হত চলতি ক্রিয়াপদ আর সর্বনাম থাকলে। 'উপর'— এর বদলে 'নামে' করা যায় না? পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির সুপারিশ অনুযায়ী 'পুলিস'-এর বানান হওয়া উচিত 'পুলিশ'। 'সুপারিন্টেন্ডেন্ট অফ পুলিস'-এর একাধিক পরিভাষা পাচ্ছি: 'পুলিশ অধীক্ষক' (কেন্দ্রীয় হিন্দি নির্দেশালয়), 'আরক্ষাধীক্ষক' (পি আচার্য) এবং 'আরক্ষাধ্যক্ষ', 'পুলিশ সুপার' (পঃ বঃ বাঃ আকাদেমি)। এর মধ্যে আমার কাছে সবচেয়ে যুতসই এবং আটপৌরে বলে মনে হয় 'পুলিশ সুপার'। যেটা বেশি চলবে, সেটাই শেষ পর্যন্ত দাঁড়াবে।

ঢাকের বাঁয়া

খবরের কাগজে 'লিগ্যাল নোটিস' স্তম্ভে প্রায়ই খটোমটো ভাষায় বিজ্ঞপ্তি বেরোয়। পড়তে হোঁচট খেতে হয়।

এরকমই একটা বিজ্ঞপ্তি দেখলাম। তার কিছু অংশ সাদামাঠা কথায় বলা যাক। যদিও আইনি বিজ্ঞপ্তি, তবুও এটা হয়তো বেআইনি কাজ হবে না।

'... আপনাকে এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে এই নোটিস জারি করার ১৫ দিনের মধ্যে উক্ত সার্টিফিকেট সম্পর্কে ১৬, ৮৩, ৮৩৬.১৫ টাকা তদুপরি ইতিমধ্যেই ব্যয়িত খরচ, চার্জ ও ব্যয় বাবদ ১৫,০০০ টাকা এবং নিম্নোক্তমতো সুদ আপনি আদায় না দিলে উক্ত সার্টিফিকেটের অর্থ তৎসহ ১০/২/৯৬ তারিখ হইতে উসুল/ আদায়ের প্রকৃত তারিখ পর্যন্ত বার্ষিক ১৬% হারে সুদ এবং সার্টিফিকেটের অর্থ আদায়ের জন্যে পরোয়ানা এবং ইস্যু করা অন্যান্য প্রক্রিয়া এবং অন্য সকল কার্যাদি বাবদ ব্যয়িত খরচ, চার্জ ও ব্যয় আপনার নিকট হইতে উসুলের জন্যে ১৯৯৩-এর রিকভারি অফ ডেটস ডিউ টু ব্যাঙ্কস অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ইন্সটিটিউশন্স অ্যাক্টের ২৫ এবং ২৮ ধারার এবং ১৯৬১ সালের আয়কর আইনের দ্বিতীয় শিডিউলের যে কোন বা সমস্ত বিধানাবলি (যাহা ১৯৯৩-এর রিকভারি অফ ডেটস ডিউ টু ব্যাঙ্কস অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ইন্সটিটিউশন্স অ্যাক্টের ২৯ ধারা অধীনে প্রযোজ্য), অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।...' আইনি ভাষা তো। সুতরাং এর প্যাঁচপয়জারও আলাদা।

'ডেটস রিকভারি' বাংলায় 'ঋণ উসুল' হতেই পারে। কিন্তু 'ট্রাইবুনাল'? 'অধিকরণ' (কেঃ হিঃ নিঃ), 'ন্যায়পীঠ' (পি আচার্য), 'ট্রাইবুনাল' (পঃ বঃ বাঃ আঃ)— আমার পছন্দ 'ট্রাইবুনাল'। কেননা ট্রাম, ট্রাক, ট্রায়াল-এর সঙ্গে ট্রাইবুনাল খুব একটা বেমানান নয়। 'সল্টলেক সিটি' না বলে 'বিধাননগর'ও বলা যায়। 'ফিনান্সিয়াল ইন্সটিটিউশন' হতে পারে 'আর্থিক সংস্থা'। 'অ্যাক্ট'-এর বাংলা আইন বা বিধান। 'শিডিউল' হতে পারে 'অনুসূচী' (কেঃ হিঃ নিঃ), 'অনুসূচি', 'তফসিল' (পি আচার্য), 'তফশিল', 'তালিকা' (পঃ বঃ বাঃ আঃ)— 'তফশিল'ই বেশি চলে। 'রুল': 'নিয়ম' (কেঃ হিঃ নিঃ), 'নিয়মাবলী', 'আদেশ', 'বিধি' (চারুচন্দ্র গুহ), 'নিয়ম', 'শাসন' (পি আচার্য)। পঃ বঃ বাঃ আকাদেমির বইতে আলাদাভাবে রুল-এর পরিভাষা দেওয়া নেই। 'আপনাকে এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা হইতেছে'-র বদলে 'আপনাকে জানানো

হচ্ছে' লিখলেই তো হয়। 'সার্টিফিকেট'-এর বিকল্প হিসেবে 'প্রমাণপত্র'ও লেখা যায়। ইস্যু করার বদলে 'জারি করা' বা 'লাগু করা' বলা যায় কি? 'যে কোন বা সমস্ত বিধানাবলি'-কে আরও খোলসা করে 'যে-কোনও একটি অথবা একত্রে সব কটি বিধান' লিখলে হয়তো বাংলার গা থেকে ইংরিজির গন্ধ কমানো যেত।

দফে দফে

এবার দেখা যাক, এক নিশ্বাসে অতগুলো যৌগিক বাক্য না বলে থেমে থেমে দম নিয়ে বললে অর্থহানির ভয় থাকে কিনা।

নোটিশে ঋণের মোট প্রায় সতেরো লক্ষ টাকার উল্লেখ করা হয়েছে। অতে যোগ হবে ইতিমধ্যে খরচখরচা হওয়া ১৫,০০০ টাকা। এছাড়া আছে এতদিন ধরে আসলের ওপর বার্ষিক ১৬% হারে বকেয়া বছর পাঁচেকের সুদ।

নোটিশ জারির ১৫ দিনের মধ্যে ওই টাকা পরিশোধ না করলে মৃতের উত্তরাধিকারীকে আইনমতে আদালতে সোপর্দ করা হবে।

এভাবে ভেঙে বললে বুঝতে যে সুবিধে হয়, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তাতে আইনি যুক্তিশৃঙ্খলায় টান পড়ে কিনা, সেটা আইনজ্ঞরা বলতে পারেন।

একজন একতরফা বকে যাবে, বাকি সবাই গালে হাত দিয়ে শুনবে আর মাঝে মাঝে হাই তুলবে— এমন ভেবে এ আসর ডাকা হয়নি। পাঠকদের কাছে বিনীত অনুরোধ, এটা মনে রাখবেন যে, আপনাদের সওয়াল-জবাব আর চাপান-উতোর ছাড়া এ আসর কিছুতেই জমবে না।

ঘরে ও বাইরে

'ফর অবভিয়াস রিজনস', 'ফ্রেট ইকোয়ালাইজেশন', 'পারটিকুলারলি আফটার নাইনটি ফোর', 'আফটার অ্যানাউন্সমেন্ট অব আওয়ার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি', 'আইটিতে হিউম্যান রিসোর্স', 'ব্রেক থ্রু', 'এগ্রিকালচার প্রোডাকশনে গ্রোথ রেট', 'প্রোডাক্টিভিটি হাইয়েস্ট', 'অ্যাগ্রো-বেস্‌ড ইন্ডাস্ট্রিতে', 'ডাউন স্ট্রিমে', 'ইস্টার্ন জোনে', 'বিগেস্ট', 'বেনিফিট', 'লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট', 'নলেজ ইন্ডাস্ট্রি', 'রিয়েল চ্যালেঞ্জ', 'টুয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরির ইন্ডাস্ট্রি', 'পশ্চিমবঙ্গের ইমেজটাকে', 'বাট উই আর অ্যান ইনভেস্টমেন্ট ফ্রেন্ডলি গভর্নমেন্ট', 'নট ওনলি ইন আওয়ার স্পিচেস,

বাট অন প্র্যাক্টিস', 'প্রাইভেট পার্টিসিপেশন ইন ইনফ্রাস্ট্রাকচার', 'অ্যাকচুয়ালি', 'নরম্যাল', 'সেকেন্ড পয়েন্ট', 'পারটিকুলার প্রবলেম', 'টোটাল আনসারটেইনিটি', 'নাউ উই এনকারেজ', 'সেভেন্টি পারসেন্ট অব দি পিপলস', 'অ্যাসিওর', 'ইনোসেন্ট পিপলের ওপর অ্যান্ড দেয়ার প্রপার্টি', 'তখন ইট মাস্ট অ্যাক্ট', 'উই মাস্ট স্টপ অল দিজ', 'পলিটিকাল ডায়ালগ ওপ্ন করার'...।

বাংলা বলতে গিয়ে যাঁর মুখ ফস্‌কে এই ইংরিজি কথাগুলো বেরিয়েছে, তিনি হেঁজিপেঁজি লোক নন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। বাংলা ভাষায় তাঁর দখল অবিসংবাদিত।

'প্রতিদিন'— সম্পাদক অঞ্জন বসুর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে প্রসঙ্গক্রমে কথাগুলো এসেছে। দুজন বাঙালী এক হলে এইভাবেই আমরা ইংরিজি মিশিয়ে ঘরোয়া বাংলা বলে থাকি। কিন্তু নিজের খাসকামরায় বসে বললেও কাগজে তা যে হাটখোলা হয়ে বেরোবে, মুখ্যমন্ত্রী বোধহয় বলবার সময় তা মনে রাখেননি। নইলে তিনি কখনই 'বিগেস্ট' 'বেনিফিট' 'অ্যাকচুয়ালি' 'নরম্যাল' শব্দগুলো অনর্থক ব্যবহার করতেন না।

চালুনি আবার ছুঁচের বিচার করে! এই বলে কেউ যদি এক্ষেত্রে আমাকে কড়কায়, আমার ঘাট না মেনে উপায় নেই। কেননা ওপরে উদ্ধৃত অনেক ইংরিজি কথার যুতসই বাংলা আমার জানা নেই।

যেমন, 'চ্যালেঞ্জ'। এর মধ্যে আছে নিজেকে প্রমাণ করার ব্যাপার। পাঞ্জা কষা। টক্কর দেওয়া। অগ্নি পরীক্ষা। কিংবা শব্দটাকে দস্তক নিতেই বা দোষ কী?

'ব্রেক-থ্রু'। কেটে বেরোতে পারা। মুক্তির উপায়। গতি। হিল্লে।

'হিউম্যান রিসোর্স'। মানব সম্পদ। লোকবল বা কাজের লোক বলা যায় না?

'ডাউন-স্ট্রিম'। 'ধারাবাহিক' হতে পারে কি?

'নলেজ ইন্ডাস্ট্রি'। মাথা খাটানো শিল্প হয় কি? নিশ্চয় 'জ্ঞান-কাণ্ড কারখানা' নয়?

পরধর্ম আর শুচিবাই

বাংলায় ইংরিজি বুলি কপচানো কমাতে হবে। বেশি লাই দিলে ইংরিজি আবার মাথায় চড়ে বসবে।

র'য়ে স'য়ে ইংরিজি শব্দ ব্যবহার করলে যেমন বাংলার মান যাবে না, অন্যদিকে তেমনি শুচিবাই না পেয়ে বসে। ইংরিজি ঠেকাতে গিয়ে তখন

আমাদের পেড়ে ফেলবে গোবরজলের ছিটে-দেওয়া বিশুদ্ধ বাংলা।
ভবিষ্যতের কথা জানি না। কথাবার্তায় এখনও আমাদের দু নৌকোয় পা দিয়েই চলতে হবে।
খাতায় কলমে লিখব এক, মুখে বলব আরেক। লিখব 'বিমান', বলব 'প্লেন'। 'লবণ হ্রদ' লিখলেও, বলব 'সল্টলেক'।
এ প্রসঙ্গ শিকেয় তুলে এবার একটু অন্য কথায় আসা যাক।
এক সময়ে একটা মজাদার বিজ্ঞাপন বার হত। 'আপনি কী হারাইতেছেন জানেন না।'
ঝাঁকায় কলা নিয়ে এক ফেরিওয়ালা যাচ্ছে। দোতলা থেকে একটা বিচ্ছু ছেলে সুতোয় লাগানো বড়শিতে গেঁথে এক কাঁদি কলা লোকটার অগোচরে তুলে নিচ্ছে।

বাংলা বোলচাল

বাংলায় আমাদের বেশ কিছু বোলচাল (ইংরিজিতে যাকে বলে 'ফ্রেজ') আছে, যা এইভাবে আমাদের হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। ফলে এ ভাষা তার নিজস্ব মাধুর্য হারিয়ে ফেলছে।
যেমন : করা, হওয়া, ওঠা, পড়া, বলা, চলা, খাওয়া, কাটা, ছাড়া, ডাকা, থাকা, লাগা, রাখা।

করা

মুখে বললে হবে না, করে দেখাও। মনে করে দেখ। মন কেমন করা। করো কী, করো কী! এক কাজ করো। লোকটা দিব্যি করে খাচ্ছে। মনে করো। ঘর করা। কাজটা ওকে দিয়ে করাও। করলেই হল? বাড়ি করা। বাগান করা।

হওয়া

ছেলে হওয়া। মানুষ হওয়া। বয়েস, বেলা, বুদ্ধি (বৃদ্ধি অর্থে) হওয়া। হওয়া ইস্তক আমরা এ বাড়ির ভাড়াটে। আর বেশিদিন নেই, আমার হয়ে এসেছে। হওয়া চাকরি হাতছাড়া হল। ওর জুতো আমার পায়ে হয় না। কাজটা হতে হতেও হল না। হয়কে নয় করা আর নয়কে হয় করা। হওয়ার আর আছে কী? হল তো। হল এবার। ঐ হল।

ওঠা

এবার ওঠা যাক। সকালে ওঠা। দাঁত ওঠার বয়স। ক্লাসে উঠলে বই কেনার পালা। এই বয়সে যা গায়, ও খুব উঠবে। ছেলেটার চোখ উঠেছে। ওকে বাসে উঠিয়ে দিয়ে এসো। দোকানটা উঠে গেল। বাড়িওয়ালা ওঠাতে চায়। উঠি-উঠি করছি, এমন সময়। উঠন্ত মুলো। উঠল বাই।

পড়া

মনে পড়া। রাগ পড়ে যাওয়া। ওর সব দাঁত পড়ে গেছে। তোমার পায়ে পড়ি। আকাশ থেকে পড়া। পড়ে-পাওয়া। জিনিসের দর আর পড়বে না। লোকটা ভারি গায়ে-পড়া। বাড়িটা পড়ো-পড়ো। প'ড়ে প'ড়ে মার খাওয়া। পড়ি মরি ক'রে ছুটলাম। ওর ওপর আমার খুব মায়া পড়ে গেছে। ও জিনিস বাজারে পড়তে পাবে না। সকাল থেকে কিছুই পেটে পড়েনি। হাত থেকে পড়ে না যায়। ওঁদের এখন পড়ন্ত অবস্থা।

বলা

বলা সহজ, করা কঠিন। ওর বিয়েতে আমাকে বলেনি। এ বিষয়ে তুমি কী বলো। তাহলে তুই বলছিস! আগে থেকে বলে নিলে ভালো হয়। বলা ভালো। তা যা বলেছ। বলতে নেই। তাই বলো। এতে আর বলাবলির কী আছে? বললেই হয়। বলতে বলতে। বলি-বলি করেও কথাটা বলতে পারছিলাম না। আগে থেকে তাকে ব'লে-ক'য়ে রেখো। হরি বলো, আমি ভেবেছিলাম কী না কী। আমি ওকে বলতে ছাড়িনি।

চলা

পাম্প চলছে। সংসার চলছে না। ক্যামেরা চলছে। এ বই চলবে না। এ জিনিসের এখন খুব চল। সব বিলি ব্যবস্থা করে ঠাকুরদা চললেন। চল না, যাই। রাতভর যাত্রা চলবে। ছোটটা চলে বেড়াতে শিখেছে। পানের সঙ্গে জর্দা চলবে?

খাওয়া

সব সময় ওর খাই-খাই। ঐ লোকটাই ওর মাথা খেয়েছে। ও খুব খাইয়ে লোক। সবার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হয়। ও লোকটা টাকা খেয়েছে।

বইগুলো ইঁদুরে খেয়েছে। মাছ খাচ্ছে কিন্তু ধরতে পারছি না। অতিরিক্ত লোভই ওকে খেল। খেতে পেলে শুতে চায়। চরে খাওয়া।

কাটা

বঁটিতে আঙুল কেটেছে। দিন আর কাটে না। দুধ কেটে গেছে। তাল কাটা। টিকিট কাটা। এখান থেকে কেটে পড়ো। ও লোকটা গাঁট কাটা। লজ্জায় জিভ কাটা। ছড়া কাটা। কাটাকুটি করা। কেবল মারামারি আর কাটাকাটি। ওঁর বইয়ের খুব কাটতি। পাশ কাটানো। কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে। কাটা-কাটা কথা। বেজায় ঠোঁট কাটা লোক। ওর কাটা কাপড়ের ব্যবসা।

ছাড়া

সিগারেট খাওয়া ছাড়ো। ওটা কাপড় ছাড়ার জায়গা। ছাড়ো তো। এবার আর ছাড়াছাড়ি নেই। ওদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে, একসঙ্গে নেই। ছাড়লে বাঁচি। কাউকে ছেড়ে কথা বলে না। সবে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে। ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি।
এখানেই ছাড়ছি।

কথা বেচে খাওয়া

অবাক হওয়ার ব্যাপারই বটে।
বাংলাভাষা গেল-গেল বলে আমরা যখন পাড়া মাথায় করছি, ঠিক তখনই টিভিতে ঢাকঢোল বাজিয়ে ফটাফট খুলে গেল গুচ্ছের বাংলা চ্যানেল।
খেলা কথা নয়।
যারা এ কাজের কাজি, তারা ভস্মে ঘি ঢালার লোক নয়। বাগ্‌দেবীকে ধরে তারা চায় স্রেফ লক্ষ্মী লাভ করতে। এ রাজ্যের মানুষকে হাত করতে গেলে বাংলাভাষার দোর না ধরে উপায় নেই। এটা তারা বুঝেছে।
বাংলাকে এইভাবে কাজে লাগানোর দরুন কিছু বেকার ছেলেমেয়ের সামনে রুজিরোজগারের নতুন একটা রাস্তা খুলেছে।
কর্তারা যদি মর্জি করেন, তাহলে বাংলাভাষাকে আরও বিস্তর কাজে লাগানো যায়।
সিনেমা টিভিতে বাংলায় ডাবিং আর সাবটাইটল-এর ঢালাও ব্যবস্থা করা হোক।

বাংলা পত্রপত্রিকায় সব বিজ্ঞাপনই পুরোপুরি বাংলায় হোক।
ভারতীয় এবং অভারতীয় নানা ভাষায় তালিম দিয়ে তৈরি করা হোক পেশাদার অনুবাদক আর দোভাষী।
ভূভারতের আগন্তুক অতিথিদের সঙ্গে বাক্যালাপে রাজ্যের মন্ত্রীরা প্রকাশ্যে যথাসম্ভব এই দোভাষীদের কাজে লাগান। তাতে বাংলাভাষারও মান বাড়বে।
শুধু বাইরের সঙ্গে রাজ্যের যোগাযোগে নয়, এ রাজ্যের অবাংলাভাষীদেরও তাদের নিজেদের ভাষায় কাছে টানার ব্যবস্থা করা হোক।
বাংলাকে কাজে লাগিয়ে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রকে বড় করতে না পারলে শুধু কথায় চিঁড়ে ভিজবে না।

শিবের জটা

যে ভাষার খেতে দেবার মুরোদ নেই ছাঁপোষা মানুষ কেন তাকে কদর দেবে? ক্ষমতার আকাশগঙ্গা শিবের জটায় এখনও বাঁধা পড়ে আছে। তাকে মাটিতে নামিয়ে সহস্রধারায় ছড়িয়ে না দেওয়া পর্যন্ত বাংলা এ রাজ্যে দুয়োরানী হয়েই থেকে যাবে। আজ যারা পরের ধনে পোদ্দার হয়ে মাথায় বসে আছে, সমাজের সেই ওপরের স্তরে ইংরিজিতেই স্বচ্ছন্দে কাজ চলে যায়।
ক্রমে শিবের জটা খুলতে শুরু করেছে। ক্ষমতার মুক্তধারায় যে জনমানবের অভিষেক হবে তাদের কাছে বাংলার কোনও বিকল্প থাকবে না। তাই তখন এক পা এগিয়ে দুপা পিছোবার আর প্রশ্ন উঠবে না।
কারও সাধ্য নেই গণতন্ত্রের এই জয়যাত্রা ঠেকাবার।
ইংরিজিকে আমরা মুরুব্বির আসনে বসাব না। ইংরিজি হবে আমাদের হাত-নুড়কুৎ। যখন যেভাবে দরকার, তখন সেইভাবেই আমরা তার সাহায্য নেব। শুধু দেখতে হবে যেন তাতে ফতোকাপ্তানি কিংবা আদেখলেপনার ভাব না থাকে।
কাজের কথায় ফেরার আগে একটা বিষয় যেন আমরা মনে রাখি। ভাষার কোনও ছোটবড় নেই। জো পেলে সব ভাষাই যে-কোনও কাজ হাসিল করতে পারে। ভাষা বলতে তো নামৈব কেবলম্।
সব ভাষার মতোই, বাংলাভাষারও নিজস্ব কিছু ধাত আছে। শব্দের কিছু স্বভাব আর বোলচালের আলাদা কিছু ধরন।

ভাষার ছিরিছাঁদ

আমরা যেমন কাজ করতে গিয়ে শুধু দায় সারি না। চেষ্টা করি যাতে কাজের একটা সৌকর্য থাকে। কাজের কথা বলতে গিয়েও তাই ভাষার একটা ছিরিছাঁদ বজায় রাখতে হয়।

বাংলা ভাষার একটা বড় গুণ তার অনুকার শব্দ। কানে শুনলেই মনশ্চক্ষে তার একটা ছবি ভেসে ওঠে। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তাঁর 'শব্দকথা' বইতে এ নিয়ে সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথও সেদিকে আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে ভোলেননি।

রামেন্দ্রসুন্দর বলেছেন, 'নৈসর্গিক ধ্বনির অনুকরণজাত বাঙ্গালা শব্দের সম্পূর্ণ তালিকা এ পর্যন্ত কেহ প্রস্তুত করেন নাই। প্রচলিত বাঙ্গালা কোষ — গ্রন্থে এই শ্রেণির শব্দের স্থান নাই, দয়া করিয়া দুই চারিটাকে স্থান দেওয়া হয় মাত্র; কিন্তু চলিত মৌখিক ভাষায় ইহাদের সংখ্যার সীমা পাওয়া যায় না।'

রাস্তায় ভিড় বোঝাতে আমরা বলি: 'গিজগিজ করছে লোক'।

ভনভন করছে মাছি। চনচনে রোদ। ছলছল করছে চোখ। দগদগে ঘা। টলটলে জল। ঘোড়া টগবগ করে ছুটছে। নড়বড়ে সাঁকো। চুরচুর হয়ে ভাঙা। কনকনে শীত। নরম তুলতুলে। ফিনফিনে ধুতি। দরজায় ঠকঠক শব্দ। কটমট করে চাওয়া। গটগট করে চলে যাওয়া। মেজাজ খিটখিটে হওয়া। গ্যাঁট হয়ে বসা। ধেইধেই করে নাচা। চোখ পিটপিট করা। গা ম্যাজম্যাজে করা। আইঢাই ভাব। আনচান করা।

এভাবে বললে মনের পর্দায় সবাকছবি ফুটে ওঠে। ধ্বন্যাত্মক শব্দের এক দীর্ঘ তালিকা দেওয়া আছে রবীন্দ্রনাথের 'শব্দতত্ত্ব' বইতে।

এছাড়া আছে শব্দদ্বৈত।

জোড় শব্দ

একের বেশি বোঝাতে আমরা বলি: গ্রামে গ্রামে। গাছে গাছে। বারে বারে। মধ্যে মধ্যে। কথায় কথায়। দিনে দিনে। ফিরে ফিরে।

পাথরে পাথরে ঠোকাঠুকি। মানুষে মানুষে মিল। চোখে চোখে ইশারা। আগে আগে যাই। পাশে পাশে চলি। তলে তলে। ওপরে ওপরে। বাইরে বাইরে। মনে মনে। পেটে পেটে।

যেতে যেতে। চলতে চলতে। গড়াতে গড়াতে। ঠেলে ঠেলে। কেঁদে কেঁদে। ঘুরে ঘুরে। হেঁটে হেঁটে।

ঘন ঘন। নতুন নতুন। ঢের ঢের। ফালা ফালা।
লাল লাল ফুল। কালো কালো দাগ। লম্বা লম্বা লাঠি। রকম রকম পোশাক।
যার যার। যে যে। এত এত।
আশায় আশায় থাকা। ভয়ে ভয়ে পিছনো। তক্কে তক্কে থাকা।
টাটকা টাটকা। গরম গরম।
হাতে হাতে। কানে কানে। পায়ে পায়ে। গলায় গলায়।
নিজে নিজে। পর পর। তখন তখন। আপনি আপনি।
পড়ো-পড়ো। যাব-যাব। ফাঁকা-ফাঁকা। উঠি-উঠি। ভিজে-ভিজে। ভাসা-ভাসা। কাঁদো-কাঁদো। ঝাল-ঝাল।
সেইসঙ্গে : টুকরো-টাকরা। উসখুস। দড়াদড়ি। কড়াকড়ি। বাঁধা-ছাঁদা।
বোঁচকা-বুঁচকি। পুঁটলি-পাঁটলা। সাদামাঠা। ফুটোফাটা। গোলাগুলি। কমসম। ফলটল। কাগজটাগজ। ফুর্তিফার্তা। রকম সকম। আঁট-ঘাট। অন্ধিসন্ধি। গলিঘুঁজি।
উদাহরণ আর বাড়ানো নিরর্থক। কেননা বাংলায় এর অন্ত নেই।

সাধু বনাম চলিত

এক সময়ে সাধু আর চলিত ভাষা নিয়ে বাংলাভাষায় যে মল্লযুদ্ধ হয়েছিল, তাতে প্রমথ চৌধুরীর পক্ষ নিয়ে জোর লড়াই করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বলেছিলেন, 'যখন লেখার ভাষার সঙ্গে মুখের ভাষার অসামঞ্জস্য থাকে, তখন স্বভাবের নিয়ম অনুসারেই এই দুই ভাষার মধ্যে কেবলি সামঞ্জস্যের চেষ্টা চলিতে থাকে। ইংরেজি গদ্য সাহিত্যের প্রথম আরম্ভ হইতেই এই চেষ্টা চলিতেছিল। আজ তার কথায় লেখায় সামঞ্জস্য ঘটিয়াছে বলিয়াই উভয়ে একটা সাম্যদশায় আসিয়াছে।...'
'সবুজপত্র'-সম্পাদক বলেন 'বেচারা পুঁথির ভাষার প্রাণ কাঁদিতেছে কথার ভাষার সঙ্গে মালা বদল করিবার জন্যে। গুরুজন ইহার প্রতিবাদী। তিনি ঘটকালি করিয়া কৌলিন্যের নির্মম শাসন ভেদ করিবেন এবং শুভবিবাহ ঘটাইয়া দিবেন। — কারণ কথা আছে, 'শুভস্য শীঘ্রম্'।....'
পণ্ডিতমশাইরা যে ক্রিয়াপদ বানিয়ে লিখিত বাংলাভাষার মাথা মুড়িয়ে তাকে সাধু সাজিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ প্রমাণ করে দেখালেন যে, আদতে সেটা 'বাংলাই নয়।'

চাইলেই যা হয়

যাদের বয়সের গাছপাথর নেই, সেই আমরাও ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি গান আর আবৃত্তির প্রতিযোগিতা।

নাচ এসেছে পরে তারও ঢের পরে বসে-আঁকো। হয়েছে সব কিছুতেই তালিম নেবার ব্যবস্থা।

বুদ্ধদেব বসু এত করে যেটা চেয়েছিলেন, এতদিনেও হয়নি সেই 'লেখার স্কুল'।

এই একটা ব্যাপারে বাঙালী আজও কেন পিছিয়ে রইল, এটা ভেবে খুব আশ্চর্য লাগে।

লেখার ঘটকালি

সেইসঙ্গে নেই দেশবিদেশের পত্রপত্রিকা আর প্রকাশকদের সঙ্গে লেখকদের ঘটকালি করিয়ে দেবার কোনও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। যাকে বলা হয় লিটারারি-এজেন্ট।

ভূপালে একবার এক হিন্দি সাংবাদিকের কথায় এ বিষয়ে আমার প্রথম টনক নড়ে। এক সময়ে সে ছিল জে-এন-ইউয়ের দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতা।

তার বক্তব্য ছিল এই: সারা ভারত জুড়ে নানা ভাষায় অজস্র পত্রপত্রিকা। খুশবন্ত সিং, কুলদীপ নায়ার এবং এঁদের মতো ইংরিজি লিখিয়েরা এর ফায়দা তোলেন। তাঁদের লেখা নানা ভাষায় অনুবাদ হয়ে বিস্তর কাগজে বেরোয়। এর জন্যে তাঁরা দস্তুরমতো ভালো দক্ষিণা পান। তাঁদের দেখাদেখি হিন্দি লেখকেরাও নাকি এই পন্থায় নিজেদের অবস্থা ফিরিয়েছেন।

সিন্ডিকেট ব্যবস্থায় বাংলা লেখকেরাও এই বাজার ধরতে পারেন। দরকার উদ্যোগী কিছু লোক। এতে তাঁরাও লাভবান হবেন। কেননা লেখকদের রোজগারে তাঁদেরও একটা বখরা থাকবে।

কেনইবা হবে না লেখার ইস্কুল?

পিঠ না চাপ্‌ড়ে পৃষ্ঠপোষণ

লিট্‌ল ম্যাগাজিন নিয়ে আমরা যেটা করি, তার বেশির ভাগটাই আমড়াগাছি। পিঠ চাপড়েই খালাস।

না ছাপানো পর্যন্ত লেখালিখিতে তেমন খরচ নেই। ফলে, লেখাই হয় আত্মপ্রকাশের সবচেয়ে জনপ্রিয় বাহন। এরপরই পাঠক জোটানোর সাধ

হয়। কাঁচা হাত আর নড়বড়ে ভিত। তাই দিয়ে কাগজ ছাপা হয় বটে, কিন্তু পাঠক সমাজে তার কোনও ছাপ পড়ে না।

এসব কাগজের ভাষা, বানান, ছাপাই, বাঁধাই, পৃষ্ঠাসজ্জা আর বিষয় নির্বাচন —সব কিছুতেই দিশাহীন আর আনাড়ি ভাব স্পষ্ট।

অথচ একটু শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে পারলে এসব ছোট ছোট পত্রপত্রিকাগুলো রীতিমতো দাঁড়িয়ে যেতে পারত। তাহলে আর এই তারুণ্যের অপরিমেয় শক্তি বেহিসেবি হয়ে মাঠে মারা যেত না।

শুধু হাততালি দিয়ে পিছন ফিরে সরে পড়া নয়। দরকার এগিয়ে এসে হাত ধরে টেনে তোলার।

লিট্‌ল কথাটাও ছেঁটে ফেলা দরকার। আহা-বেচারা বলে করুণা করার মধ্যে থাকে একটা ছোট করার ভাব।

গোড়াতেই এইসব কাগজ নিজেদের সামর্থ্য আর রুচি অনুযায়ী একেকটা বিশেষ দিক বেছে নিক। যেমন: হাস্যরস, ব্যঙ্গকৌতুক, আঞ্চলিকতা, লোককথা, ছড়া-হেঁয়ালি-প্রবাদ সংগ্রহ, মহাকাব্য-পুরাণ, নৃতত্ত্ব, জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানাদিক —এইভাবে একঘেয়ে থোড় বড়ি খাড়া ভাব কাটানো। পাঠক তো কাগজ নিজেরা সেধে নেবে। কাউকে জোর করে গছাতে হবে না। মন করলেই করা যায়। দরকার একটু শুধু মনের জোর।

সেইসঙ্গে লকেট করে যেন বুকে ঝুলিয়ে রাখি বিবেকানন্দের বাণী— ফাঁকি দিয়ে কোনও মহৎ কাজ সিদ্ধ হয় না।

ঘাস-বিচালি-ঘাস

প্রাথমিক স্কুলের একজন প্রধানশিক্ষক সেদিন দুঃখ করে বললেন সরকারি সব সার্কুলার এখনও নাকি ইংরিজিতেই আসে।

রোজ বাংলা কাগজ খুললে হাতে-নাতে তার প্রমাণ মিলবে।

আনন্দবাজারে একই দিনে আলাদা আলাদা পৃষ্ঠায় বেরিয়েছে কমবেশি সিকি পৃষ্ঠা জুড়ে দুটি সরকারি বিজ্ঞপ্তি। একটি দিচ্ছেন পূর্ত বিভাগ (রাস্তা) আগাপাস্তলা ইংরিজিতে। অন্যটি পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ পর্ষদের। আগাগোড়া বাংলায়। দুটিরই বিষয় মোটামুটি এক। প্রথমটিতে ভিত্তি পত্তন। দ্বিতীয়টিতে শুভ উদ্বোধন।

এসব দেখে লোকে তো ঠেস দিয়ে বলবেনই— সরকার হল দু মুখো।

যাঁরা সরকারের মাথায়, তাঁদেরও এদিকে হুঁশ কম।

বিদেশী হোমরাচোমরা ব্যক্তিরা হরবখত তাঁদের সঙ্গে মোলাকাত করতে আসেন। এঁদের অনেকের সঙ্গেই থাকেন দোভাষী।
আমাদের কর্তাদের সে বালাই নেই। ঝাড়া হাতপা হয়ে ইংরিজিতেই তাঁরা বাৎচিত্ করেন। এরাজ্যের ভাষা যে বাংলা, বহিরাগতদের সেটা জানার কোনও সুযোগ হয় না। এতে যে বাংলাভাষার মাথা কাটা যায়, সেটা কারও চোখে পড়ে না।
আমাদের গা-ছাড়া ভাবের জন্যে ইংরিজি আজও কিভাবে বাংলার ঘাড়ে চেপে বসে আছে, চারপাশে তাকালেই তা নজরে পড়বে।
যখন আমরা বলি, 'টেবিলের ওপর বই রেখেছি', তখন ভুলে যাই যে, 'ওপর'-এর আড়ালে থাকছে ইংরিজি 'অন'। নইলে শুধু 'টেবিলে' বললেই বাংলায় তা যথার্থ হত। বলা হয় 'ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্যে ক্ষতিকর'। কেন বলি না স্বাস্থ্যের 'পক্ষে' কারণ, ইংরিজি 'ফর' কথাটা বাংলায় মাথা চাড়া দেয়।

এখনও দাসখত

বিজ্ঞাপনে ইংরিজির বাংলা করতে গিয়ে প্রায়ই খুব ফ্যাসাদে পড়তে হয়। মাস্টার কপি হয় ইংরিজিতে। ছবি এক রেখে শুধু পাঠ্যাংশের ভাষান্তর হবে। নইলে দুনো খরচ। যাতে আরও খরচ বাঁচে, তাই এখন বাংলা কাগজেও ইংরিজিতে বিজ্ঞাপন দেবার ঝোঁক ক্রমেই বাড়ছে।
ইংরিজি কথার মারপ্যাঁচের সঙ্গে ছবির ভাব যখন জড়ানো থাকে, ভাষান্তর করতে গিয়ে তখনই ঘোল খাওয়ার অবস্থা হয়।
'লুক বিফোর ইউ লিপ' পড়ে যে ছবি আঁকা হয়েছে, তার পাশে বাংলায় 'ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখনি' আদৌ কি খাপ খাবে? অগত্যা লিখতে হয়— 'আগে দেখে পরে লাফ'। যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতম্।
ইংরিজি বিজ্ঞাপনে সব সময়ে বড় বড় অক্ষরে কোনও পণ্য বা উৎপাদকের নাম আলাদাভাবে পাঠকের চোখে তুলে ধরা হয়। কিন্তু বাংলায় '-কে' '-এর' —এইসব লেজুড় লাগে। ইংরিজিতে 'বাটা শু' বললেই চলে। কিন্তু বাংলায় বলতে হয় 'বাটা-র জুতো'। ফলে, ইংরিজির জোর খাটাতে গিয়ে বাংলা কুপোকাত হয়।
'থেকে'-র ব্যবহারটাও অনেক সময় গোলমেলে হয়। 'তোমার থেকে আদায় করব'। বলা ভালো, 'তোমার কাছ থেকে'। শুধু 'থেকে' বললে

বুঝি পিছনে আছে ইংরিজি 'ফ্রম'। 'গাছ থেকে ফল পেড়ে খাই, তলা থেকে ফল কুড়িয়ে খাই' —অত কথার দরকারটা কী? বললেই হয় 'গাছের খাই, তলার কুড়োই'। 'টেবিল থেকে বইটা সরাও'-এর বদলে 'টেবিলের বইটা' বলাই কি যথেষ্ট নয়? 'এর থেকে ভালো', 'তার থেকে লম্বা'—'থেকে' নয়। হবে 'চেয়ে'। 'ওর মুখ থেকে শুনেছি' নয় —বলা ভালো, 'ওর মুখে'। 'পর্যন্ত' নিয়েও অনেক সময় আমরা ফাঁপরে পড়ি। 'পর্যন্তে'র কিছু বিকল্প থাকে। 'হিমালয় থেকে সমুদ্র পর্যন্ত'-র বদলে 'আসমুদ্র হিমাচল', 'শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত'-র বদলে বলা যায় 'যেমন শৈশবে, তেমনই যৌবনেও'। এতে ইংরিজি 'ফ্রম', 'টু', 'টিল'-এর কাঁটা এড়ানো যায়।
এর পর এ নিয়ে কথা আরও বাড়ানো যাবে।

মনকে চোখ ঠারা

মুখের কথাই মেজে ঘষে হয় লেখার ভাষা। যেমন, দক্ষিণারঞ্জনের 'ঠাকুরমার ঝুলি'।
যুগের বদলের সঙ্গে সঙ্গে বলার ধরনও বিস্তর বদলেছে।
সেকালের মানুষদের কানে এই তফাতটা প্রতিপদেই ধরা পড়ে।
মা বাবা দাদা কাকা— এই রকমের সব ডাকের মধ্যেই আগে অল্পবিস্তর সুর খেলানো থাকত। আদর, আবদার, নালিশ, অভিমান বুঝে সুরের হেরফের হত। এখনকার সম্বোধনে ব্যবহারিক কেজো ভাবটাই বেশি থাকে। যৌথ পরিবার ভেঙে যাওয়ায় আত্মীয়কুটুম্বসূচক অনেক শব্দই এখনকার ছোটদের নাগালের বাইরে। খুড়ো-জ্যাঠা বলে আগে পরকে আপন করার একটা আত্মীসূয় ভাব ছিল। এখন 'অমুকবাবু' 'তমুকবাবু' বলে কাছের লোকদের কেমন যেন দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়।
যুগপরিবর্তনের ব্যাপারটা বুঝি না তা নয়। তবু বলতে ইচ্ছে করে— আপনারা কী হারাইতেছেন জানেন না।
আমার নাতিনাতনিরা বাংলা ইস্কুলে পড়লেও তাদের ধ্যানজ্ঞান হল হিন্দি গান আর হিন্দি ছবি। বাংলায় তেমন চেষ্টা নেই তাদের মন কাড়ার।
আশার কথা, বাংলায় রব উঠেছে নবজাগরণের। তার জন্যে শুধু ভাষা, শুধু অর্থনীতি নয়— চাই সর্বোদয়। চাই সর্বঘটে নজর। ফাঁকা মাঠে যেন কেউ গোল দিতে না পারে। তাই বলে মান খোয়ানো নয়। বাংলার মান বাড়ানো।

এ রাজ্যের ওপরওয়ালারা যখন সায় দিয়েছেন, ভাষার জালটা তখন বড় করেই ফেলা দরকার।

একটু খোঁজ নিয়ে দেখুন তো এ রাজ্যের গণসংগঠনগুলোর কাজকর্ম কোন ভাষায় হয়। শ্রমিকও নন, কৃষকও নন— এমন লোক বেছে নিজেদের মুখপাত্র করা ছাড়া কেন শ্রমিক-কৃষকদের উপায় থাকে না?

নিজেদের যারা গরিবের পার্টি বলে, তাদের ভেতরের ছবিটাও এমন কিছু আলাদা নয়। ইংরিজির কাঁধে ভর দিয়েই নেতাদের চলনবলন। দেখাদেখি নিচের তলাতেও চলে তার নকলনবিশি।

রাজ্যের বাইরে মাথা গলাতে গেলেই চাই ইংরিজির ছাড়পত্র।

চোখে ঠুলি পরে আর মনকে চোখ ঠেরে কোনও লাভ আছে?

গণতন্ত্রের এখনও ঢের বাকি।

লিখতে লিখতে কমল মজুমদারের কথা মনে পড়ে গেল। কমলবাবু দিশি বাংলা খেতেন। লিখতেনও দিশি বাংলায়।

ও-এবং-আর

একবার ওয়েলিংটনের স্যাঙ্গুভ্যালিতে বসে বলেছিলেন, 'দেখুন, এই যে আপনারা লেখেন— ও, এবং— এটা বাংলা নয়।'

শুনে আমার মনে হয়েছিল—

সত্যি তো! মুখের কথায় কখনওই আমরা ওদুটো শব্দ ব্যবহার করি না।

এরপর থেকে আমি 'ও' 'এবং' ছেড়ে নিরুপায় হয়ে 'আর' ধরেছিলাম। 'আর'টাও যে খুব প্রশস্ত নয়, বড়জোর মন্দের ভালো— সেটা কখনও মাথায় আসেনি।

যে কথাটা বিয়াল্লিশ বছর আগে কমলবাবু আমার নজরে এনেছিলেন, সে কথা যে তারও বিয়াল্লিশ বছর আগে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই লিখে রেখে গেছেন, এতদিন কেন তা দেখেও দেখিনি ভেবে খুব অবাক লাগছে।

'ভাষার কথা'য় রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করেই বলেছেন: '... পণ্ডিতেরা 'এবং' বলিয়া এক অদ্ভুত অব্যয় শব্দ বাংলার স্কন্ধে চাপাইয়াছেন এবং তাহাকে ঝাড়িয়া ফেলা দায়। অথচ সংস্কৃত বাক্যরীতির সঙ্গে এই শব্দ ব্যবহারের যে মিল আছে তাও তো দেখি না। বরঞ্চ সংস্কৃত 'অপর' শব্দের আত্মজ যে 'আর' শব্দ সাধারণে ব্যবহার করিয়া থাকে তাহা শুদ্ধরীতিসঙ্গত। বাংলায় 'ও' বলিয়া একটা অব্যয় শব্দ আছে তাহা সংস্কৃত 'অপি' শব্দের বাংলা

রূপ। ইহা ইংরিজি and শব্দের প্রতিশব্দ নহে, too শব্দের প্রতিশব্দ। আমরা বলি আমিও যাব তুমিও যাবে— কিন্তু কখনও বলি না 'আমি ও তুমি যাব'। সংস্কৃতের ন্যায় বাংলাতেও আমরা সংযোজক শব্দ ব্যবহার না করিয়া দ্বন্দ্ব সমাস ব্যবহার করি। আমরা বলি 'বিছানা বালিশ মশারি সঙ্গে নিয়ো।' যদি ভিন্ন শ্রেণীর পদার্থের প্রসঙ্গ করিতে হয় তবে বলি 'বিছানা বালিশ মশারি আর বইয়ের বাক্সটা সঙ্গে নিয়ো।' এর মধ্যে 'এবং' কিংবা 'ও' কোথাও স্থান পায় না।...'

লিঙ্গ-বচন-সমাস-সন্ধি

সংস্কৃতের ঠাকুরালিতে বাংলার এই হাড়ির হাল আজও যায়নি। লিঙ্গ, বচন, সমাস, সন্ধির ভূত এখনও আমাদের ঘাড় থেকে নামেনি। পান থেকে চুন খসার ভয়ে আমাদের লিখতে হয়: মহতী সভা, কুটিলা রমণী, ফলবতী আশা, অন্নদাত্রী, প্রধানা শিক্ষয়িত্রী, ব্যাটা ছেলে, মেয়ে মরদ, মাস্টারনি, মেথরানি— মুখে বললেও লিখতে বাধে। পুরুষদের একচেটিয়া অধিকারে থাবা বসিয়ে হেন কাজ নেই যা আজ মেয়েরা করছে না। কোনও মেয়ে নাপিতের কাজ করলে, তাঁকে নাপিতানি বলা ভুল। আবার নরসুন্দরী বললেও রসিকতা বলে মনে হবে। পৌরোহিত্যের কাজেও যে মেয়েরা এগিয়ে আসছেন তাঁদের তো আর পুরুতমশাই বলা যাবে না— তবে কি বলতে হবে পুরুতঠাকরুন? ঠাকরুন বা ঠাকুরানি বলতে কিন্তু এ যাবৎ বুঝিয়েছে ঠাকুরের ঘরনী। যেমন গুরু-মা বলতে গুরুর স্ত্রী বা আচার্যানি। কাজেই বাংলায় লিঙ্গ ব্যবহারে ক্রমেই সংস্কৃতের শক্ত মুঠো আলগা করতে হবে। বাংলায় স্ত্রীবাচক শব্দের বিশেষণে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ ব্যবহারের রেওয়াজ নেই। স্ত্রীপুরুষ বোঝাতে আমরা ছেলে বা মেয়ে, মদ্দা বা মাদি শব্দ যোগ করে থাকি। আমরা সংস্কৃত 'সিংহিনী', 'হংসিনী', 'ব্যাঘ্রী'র বদলে বলি 'সিংহী', 'হংসী', বাঘিনী'।

একবচনে আমরা জুড়ি টা, টি, খানা, খানি। এক সের বোঝাতে সেরটাক বললেই চলে। বাংলা বহুবচনে আছে রকমারি ব্যবস্থা। সাধারণত প্রাণিবাচক শব্দেই 'রা' 'এরা' হয়। অনেক সময় আত্তীকরণের ভাব থেকেও বলে থাকি 'গাছেরা', 'গ্রহনক্ষত্রেরা', 'মেঘেরা'। অনেক, বিস্তর, বিভিন্ন, গুচ্ছের-এর পর নামপদের বহুবচন হয় না।

কখনও পুনরুক্তি করে, কখনও জুড়ি শব্দ বসিয়ে কিংবা পত্র বা পত্তর জুড়ে

রূপ। ইহা ইংরিজি and শব্দের প্রতিশব্দ নহে, too শব্দের প্রতিশব্দ। আমরা বলি আমিও যাব তুমিও যাবে— কিন্তু কখনও বলি না 'আমি ও তুমি যাব'। সংস্কৃতের ন্যায় বাংলাতেও আমরা সংযোজক শব্দ ব্যবহার না করিয়া দ্বন্দ্ব সমাস ব্যবহার করি। আমরা বলি 'বিছানা বালিশ মশারি সঙ্গে নিয়ো।' যদি ভিন্ন শ্রেণীর পদার্থের প্রসঙ্গ করিতে হয় তবে বলি 'বিছানা বালিশ মশারি আর বইয়ের বাক্সটা সঙ্গে নিয়ো।' এর মধ্যে 'এবং' কিংবা 'ও' কোথাও স্থান পায় না।...'

লিঙ্গ-বচন-সমাস-সন্ধি

সংস্কৃতের ঠাকুরালিতে বাংলার এই হাড়ির হাল আজও যায়নি। লিঙ্গ, বচন, সমাস, সন্ধির ভূত এখনও আমাদের ঘাড় থেকে নামেনি। পান থেকে চুন খসার ভয়ে আমাদের লিখতে হয়: মহতী সভা, কুটিলা রমণী, ফলবতী আশা, অন্নদাত্রী, প্রধানা শিক্ষয়িত্রী, ব্যাটা ছেলে, মেয়ে মরদ, মাস্টারনি, মেথরানি— মুখে বললেও লিখতে বাধে। পুরুষদের একচেটিয়া অধিকারে থাবা বসিয়েছেন কাজ নেই যা আজ মেয়েরা করছে না। কোনও মেয়ে নাপিতের কাজ করলে, তাঁকে নাপিতানি বলা ভুল। আবার নরসুন্দরী বললেও রসিকতা বলে মনে হবে। পৌরোহিত্যের কাজেও যে মেয়েরা এগিয়ে আসছেন তাঁদের তো আর পুরুতমশাই বলা যাবে না— তবে কি বলতে হবে পুরুতঠাকরুন? ঠাকরুন বা ঠাকুরানি বলতে কিন্তু এ যাবৎ বুঝিয়েছে ঠাকুরের ঘরনী। যেমন গুরু-মা বলতে গুরুর স্ত্রী বা আচার্যানি। কাজেই বাংলায় লিঙ্গ ব্যবহারে ক্রমেই সংস্কৃতের শক্ত মুঠো আলগা করতে হবে। বাংলায় স্ত্রীবাচক শব্দের বিশেষণে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ ব্যবহারের রেওয়াজ নেই। স্ত্রীপুরুষ বোঝাতে আমরা ছেলে বা মেয়ে, মদ্দা বা মাদি শব্দ যোগ করে থাকি। আমরা সংস্কৃত 'সিংহিনী', 'হংসিনী', 'ব্যাঘ্রী'র বদলে বলি 'সিংহী', 'হংসী', বাঘিনী'।

একবচনে আমরা জুড়ি টা, টি, খানা, খানি। এক সের বোঝাতে সেরটাক বললেই চলে। বাংলা বহুবচনে আছে রকমারি ব্যবস্থা। সাধারণত প্রাণিবাচক শব্দেই 'রা' 'এরা' হয়। অনেক সময় আত্তীকরণের ভাব থেকেও বলে থাকি 'গাছেরা', 'গ্রহনক্ষত্রেরা', 'মেঘেরা'। অনেক, বিস্তর, বিভিন্ন, গুচ্ছের-এর পর নামপদের বহুবচন হয় না।

কখনও পুনরুক্তি করে, কখনও জুড়ি শব্দ বসিয়ে কিংবা পত্র বা পত্তর জুড়ে

রাজ্যের ক্ষেত্রেই শুধু ইংরিজিতে চিঠিপত্র লেখা হয়। আমাদের বিভাগ থেকে অন্য বিভাগে যেসব নথি যাচ্ছে, তাতে বাংলায় নোট লেখা হচ্ছে। তাতে প্রধান সচিব এবং মন্ত্রীমহোদয়ও বাংলায় মন্তব্য বা সিদ্ধান্ত জানাচ্ছেন। অন্যান্য বিভাগ বিশেষত অর্থদপ্তরও খুব সুন্দরভাবে বাংলায় তাঁদের মন্তব্য জানাচ্ছেন বা আর্থিক অনুমোদন দিচ্ছেন। যেখানে যথার্থ পরিভাষা পাওয়া যাচ্ছে না বা খটমট ঠেকছে সেখানে বাংলা বাক্যের মধ্যে ইংরিজি শব্দ অবলীলায় ব্যবহৃত হচ্ছে। ...

'কিন্তু নিয়োগ, বদলী, পদোন্নতি প্রভৃতির মতো প্রশাসনিক আদেশনামা প্রকাশের ক্ষেত্রে এখনও কোথাও কোথাও ইংরিজির ব্যবহার হচ্ছে। যেহেতু প্রশাসকদের অনেকে নির্দিষ্ট ছকের বাইরে যেতে ভয় পাচ্ছেন— পাছে কোনও জটিলতা দেখা দেয় বা আইন-আদালতের চক্করে পড়তে হয়। ইংরিজির ক্ষেত্রে যে পূর্বনজির রয়েছে, বাংলায় তা এখনও সর্বত্র গ্রাহ্যরূপ পায়নি।

'তবে উদ্যোগ শুরু হয়েছে। এমনকী অর্থ আবণ্টন সম্পর্কিত আদেশনামা যা এতদিন শুধুই ইংরিজিতে লেখা হোত— পরীক্ষামূলকভাবে সেখানেও বাংলায় আদেশনামা প্রকাশ করা হয়েছে এবং আনন্দের কথা ট্রেজারিগুলি সেই আদেশনামা মেনে নিয়েছেন।'

নোট আর টোক

উৎপল ঝা জানিয়েছেন যে সরকারের সমস্ত বিভাগেই এখন বাংলা আকাদেমির 'প্রশাসন পরিভাষা' বইটির প্রচণ্ড চাহিদা। গত বছর নভেম্বর মাসে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে এক সেমিনারে সরকারি কাজে বাংলা ব্যবহারের খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে যে আলোচনাসভা হয়, তাতে মুখ্য বক্তা ছিলেন ডঃ পবিত্র সরকার আর সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়।

চিঠিতে শ্রীঝা এই আশা প্রকাশ করেছেন যে, যথাযোগ্য পরিভাষার আপাত অভাব ক্রমশ দূর হয়ে যাবে।

লিখেছেন: 'আমরা 'নোট' 'নোটশিট' কথাগুলি ব্যবহার করছি।'

সেইসঙ্গে খোদ প্রমথ চৌধুরীর প্রস্তাবিত একটি বিকল্পেরও উল্লেখ করেছেন। প্রমথবাবুর এই প্রবন্ধ ১৯৪৫-এর ২২ এপ্রিল যুগান্তর-সাময়িকীতে ছাপা হয়। তাতে বলা হয়েছে : 'ইংরাজী notes শব্দের বাংলায় কোনও আভিধানিক প্রতিশব্দ আছে কিনা জানিনে। তবে জমিদারি

সেরেস্তায় আমরা যাকে 'টোক' বলি। সে কথাটার ইংরিজি অনুবাদ করতে হলে notes শব্দই আমাদের ব্যবহার করতে হয়। সুতরাং 'নোট' শব্দ বাংলায় অনুবাদ করতে হলে 'টোক' শব্দ ব্যবহার করা অসঙ্গত নয়।' তাঁর সন্দেহ, 'টোকা' কথাটা এসেছে 'টোকা', 'টুকে রাখা' থেকে।

শ্রীঝা-কে অশেষ ধন্যবাদ। সেইসঙ্গে সেকালের পাঠ্যবইতে পড়া বিখ্যাত একটি কবিতার প্রবাদপ্রতিম বাক্যটি মনে পড়ে গেল: 'যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই— পেলেও পাইতে পার হারানো রতন।'

পাঠকদের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ, এই রকমের সব হারামণির খোঁজ পেলেই যেন তাঁরা আমাদের এই আসরের নজরে আনেন।

পুরোনো 'পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা' ঘাঁটতে গিয়ে আজ থেকে প্রায় এক বছর আগে প্রকাশিত 'প্রশাসনিক কাজকর্ম সহ সর্বত্র বাংলাভাষা ব্যবহারের প্রসার ঘটাতে রাজ্য সরকারের উদ্যোগ' শীর্ষক একটি ঘোষণাপত্রে চোখ পড়ল। তাতে ওই বছরের ২৯ ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত মুখ্যসচিবের একটি নির্দেশিকার উল্লেখ আছে। ওই নির্দেশিকায় 'সকল বিভাগীয় সচিবকে বলা হয়েছে যে ১ বৈশাখ ১৪০৭ বঙ্গাব্দের মধ্যে:

'সমস্ত সরকারি, আধা-সরকারি এবং স্বশাসিত সংস্থার অফিসে সাইনবোর্ড ও নামের ফলক বাংলায় লেখার ব্যবস্থা করতে হবে।

'লেটারহেড, প্যাড, ভিজিটিং কার্ড এগুলিও বাংলায় ছাপতে হবে। প্রয়োজনবোধে বাংলার পাশাপাশি ইংরাজিতেও ছাপা যেতে পারে। তবে এককভাবে শুধু ইংরাজিতে ছাপা হবে না।

হচ্ছে হবে

'পঞ্চায়েত, গ্রামোন্নয়ন, ভূমি ও ভূমিসংস্কার, পৌর বিষয়ক, প্রাণিসম্পদ বিকাশ, জলসম্পদ অনুসন্ধান ও বিকাশ, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, খাদ্য ও সরবরাহ, পরিবহন প্রভৃতির মতো যেসব দপ্তরের কাজকর্ম সরাসরি জনগণের সঙ্গে যুক্ত, সেইসব দপ্তরের সার্কুলার, আদেশনামা প্রভৃতি যতদূর সম্ভব বাংলায় প্রচার করতে হবে। রেশন কার্ড, সরকারি বাসের টিকিট, রাস্তার নাম, জন্মমৃত্যুর সার্টিফিকেট, জনসাধারণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি-আবেদন ইত্যাদি আবশ্যিকভাবে বাংলায় করতে হবে। থানার ডায়েরি ইত্যাদিও বাংলায় লিখতে হবে।

'বাংলায় লেখা সমস্ত চিঠির জবাব বাংলায় দিতে হবে।

'সরকারি নথিতে মন্তব্য ইত্যাদি যতটা সম্ভব বাংলায় লিখতে হবে।'
এই নির্দেশনামা থেকে জানা যায় যে বাঞ্ছিত লক্ষ্যে দ্রুত পৌঁছনোর জন্যে সচিব পর্যায়ে, মন্ত্রী পর্যায়ে ছাড়াও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে একটি আলাদা পরামর্শদাতা কমিটি তৈরি হয়েছে।
কাজ আরম্ভ করে ফেলে রাখার নজির চারদিকে বড় কম নয়। শিলালিপি বুকে নিয়ে ভিত্তিপ্রস্তরগুলো হয়ে ওঠে মৃত সংকল্পের কবরখানা।
কমিটিগুলো কাগুজে না হয়ে যেন কাজের হয়। বাইরের যাঁরা থাকেন নাম-কা-ওয়াস্তে, তাঁদের ওপর খুব বেশি ভরসা করা যায় না।
অথচ সরকারে গেঁয়ো যুগীর কোনও অভাব নেই। বাংলাভাষায় তাঁরা কৃতবিদ্য। সেইসঙ্গে আছে হাতেকলমে সরকারি কাজ করার অভিজ্ঞতা। কিছু আছেন কর্মরত, কিছু অবসরপ্রাপ্ত। উঁচুনিচু ভেদ না করে এই যোগ্য মানুষদের মান্যতা দিয়ে এ কাজের শরিক করা যায়।

জগা খিচুড়ি

আজ এ নিয়ে কথা বাড়াব না। ইংরেজের শাসন থেকে আমরা মুক্তি পেলেও আমাদের বাক্যালাপে ইংরিজির শাসন আজও যায়নি। সটান বাংলায় ভাবতে এখনও আমরা অভ্যস্ত হতে পারিনি বলে কথায় কথায় অকারণে ইংরিজি বাক্যবন্ধ এসে যায়। লেখায় ততটা নয়, জনসভায় বক্তৃতা দিতে গিয়েও নয়। বেশি আসে বৈঠকি কথাবার্তায়।
বাংলা নাটক নভেলের সংলাপে এর প্রচুর দৃষ্টান্ত মেলে। আমাদের শিক্ষিত সমাজে এটাই জীবন্ত বাস্তব। সুতরাং সাহিত্যেও ফোটানো হয় তারই প্রতিরূপ।
লেখায় বা বক্তৃতায় আমরা সজ্ঞানে ইংরিজির রাশ টেনে ধরি। ঘরোয়াভাবে বলবার সময় মুখের কথা কী রকম লাগামছাড়া হয়। পরের আসরে তার একটা মজাদার নমুনা দেব।
লেখা আর বলার একটা সুবিধে আছে। লেখায় কাটাকুটি করে কথার হেরফের করা যায়। অন্যদিকে, বলা কথায় চাল ফেরত নেওয়া যায় 'থুড়ি' বলে। টেপরেকর্ডারে তার জো থাকে না। ফলে টেপ হয়, টিপ্পনি কাটার মহদুপায়। আচ্ছা, 'টেপরেকর্ডারে'র বাংলা কি 'শ্রুতিধর'?

এক ইচ্ছাকল্পতরু

'খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে...' এই ভাবতে ভাবতে ফাঁকা আসরে বসে ঝিমুনির ভাব এসেছিল।

হঠাৎ 'পণ্ডিতমশাই' ডাক শুনে ধড়মড় করে উঠে বসলাম।

বুঝলাম, আসরটাকে ও পাঠশালা ঠাউরেছে।

'একটা চিঠি লিখে দ্যান।'

'দ্যান নয়, দিন।'

বলে, 'ঐ হল।'

ও-বিদ্যে জানা নেই বলায় বিশ্বাস করল না। ও শুনেছে আমি নাকি পদ্য-টদ্য লিখি। কিন্তু পদ্য লিখলেই যে দস্তুরমতো চিঠি লেখা যায় না, বললেও ও তা বুঝবে না। তাছাড়া খোঁড়া হওয়া ইস্তক, পদ্য কেন, আমি যে আর কোনও পদেরই নই —সেটাও ওর মাথায় ঢুকবে না।

কাজেই 'কাল এসো' ব'লে ওকে ঠেকিয়ে রেখে এ-বই সে-বই হাতড়াতে লাগলাম। সাধে কি আর লোকে আমাকে হাতুড়ে বলে।

যার উত্তরে ওর হয়ে আমাকে চিঠি লিখে দিতে হবে, সেটা সেই মান্ধাতার আমল থেকে চলে আসা একটা সিলমোহর করা বালি রঙের সরকারি খাম।

চাপান

বাংলায় টাইপ-করা চিঠি।

পত্রাংশে লেখা:

সমাজ কল্যাণ অধিকার
৪৫, গণেশচন্দ্র অ্যাভেনিউ
কলকাতা-৭০০ ০১৩
(অস্পষ্ট) ফেব্রু ২০০১

নং-৪৯(৮৫)-স. ক (বিবিধ)
৭ পি—১/২০০১
শ্রী গঙ্গাধর মাঝি
সমীপে

মহাশয়, এমন একটি চিঠি পেয়ে আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। অদূর ভবিষ্যতে আপনার নিজের হাতে লেখা চিঠি পাওয়ার আশা রাখি।

এবার কাজের কথায় আসি।

লিখেছেন আপনার পৈত্রিক তিন বিঘা জমি আছে। তাছাড়া রিকশা চালানোর রোজকার থেকে ব্যাঙ্কে আপনি আজীবন যে টাকা জমিয়েছেন, সুদে আসলে তার পরিমাণ নেহাৎ কম নয়।

আপনি চান এই জমিতে এমন একটা ইস্কুল করতে, যেখানে গ্রামের ছেলেমেয়েরা পড়াশুনোর সঙ্গে সঙ্গে নানা রকম হাতের কাজ করতে শিখবে। তাছাড়া চাষবাস, মাছ চাষ, হাঁস-মুর্গির খামার, গরু মোষের খাটাল, সাইকেল-মোটর-টিভি ইত্যাদি মেরামতি— সব কিছুই শেখানো হবে।

আপনার এই চিঠি আমি আপিসের লোক ডেকে ডেকে জনে জনে পড়িয়েছি।

পড়ে সকলেরই মাথা হেঁট হয়ে গেছে। সম্প্রতি এখানে আরও বেশি সুখসুবিধের দাবিতে মারমুখো আন্দোলন শুরু হয়েছিল। আপনার চিঠি আসার পর হঠাৎ দেখি সব চুপ হয়ে গেছে।

অন্যের কথা কী বলব। আমি নিজেও তো একই দোষে দোষী। কিসে মাইনে বাড়বে, পদোন্নতি হবে— আমারও তো সারাক্ষণ সেই চিন্তা।

আমি ঠিক করেছি, সামনের একটা ছুটির দিন দেখে আপনার সন্দর্শনে সোজা গ্রামে চলে যাব।

আমি কেরলের মানুষ। চাকরি সূত্রে বরাবর কলকাতায় থেকেছি। বাংলার গ্রামগঞ্জের সঙ্গে আমার তেমন পরিচয় নেই। কাজ চালানোর মতো বাংলা লিখতে শিখেছি। কিন্তু বলতে গিয়ে ঠেকে যায়। তাই ঠিক করেছি, সঙ্গে আমার এক বাঙালী বন্ধুকে নিয়ে যাব।

আমি যাওয়ার আগে আপনাকে দুটো কাজের ভার দেব।

এক, আপনাদের গ্রামে পৌঁছবার পথের হদিশ।

দুই, যেদিন যাব সেদিন স্থানীয় পঞ্চায়েতের প্রধান আর নির্বাচিত সদস্যদের সঙ্গে মুখোমুখিও বসতে চাই।

আপনার উত্তর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি যাওয়ার উদ্যোগ নেব।

সরকারের পক্ষ থেকে আপনাকে এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, আপনার ইচ্ছেমতো যাতে দ্রুতগতিতে কাজ হয়— কায়মনোবাক্যে আমরা সেটা দেখব।

আশা করি, খুব শিগগিরই আমাদের দেখা হবে।

শুভকামনা জানবেন।

ইতি
ভবদীয়
...(অস্পষ্ট) নায়ার
অস্থায়ী সচিব, সমাজ কল্যাণ দপ্তর

উত্তোর

এটা পড়ার পর বেশ খানিকক্ষণ আমি মাথা নিচু করে রইলাম।
ভেবে দেখলাম এমন একজন দেবতুল্য লোকের আদেশ যদি পালন না করি, সেটা হবে মহাপাতকের কাজ। অত বিদ্যে ফলানোর দরকারই বা কী। সহজ কথায় যা পারি তাই লিখে দেব।
বসে গেলাম লিখতে:
মাননীয় মহাশয়,
ভগবানের আশীর্বাদে আপনার চিঠি ঠিক সময়েই পেয়েছি।
আমাকে সবাই ভয় দেখিয়েছিল— সরকারের ঘরে চিঠি পাঠাচ্ছ পাঠাও। কিন্তু মনে রেখো, সরকারের কিন্তু আঠারো মাসে বচ্ছর। তোমার ও-চিঠি লাল ফিতের ফাঁস গলায় দিয়ে মরে ভূত হবে।
আমি আপনার চিঠি দেখিয়ে গ্রামের লোকদের থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দিয়েছি।
যাক এখন ওসব কথা।
ওপর মহলে চিঠি চালাচালি করার ব্যাপারে আমার বউয়েরও আপত্তি ছিল। বলেছিল, বাপ্‌রে— বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা।
এখন তারও অন্য চেহারা। গর্বে মাটিতে পা পড়ে না।
গাড়িতে বা বাসে যেভাবেই আসুন না। বাসন্তীতে নেমে ফেরি পাবেন। ফেরিঘাটে নেমে বাঁধ রাস্তায় উঠলেই আপনাদের আমি রিকশায় উঠিয়ে নেব। আমার গায়ে থাকবে নীল রঙের ফতুয়া। মাথাতেও জড়ানো থাকবে নীল রঙের গামছা।
ব্যস, মিনিট পঁচিশের মধ্যেই আমরা যথাস্থানে পৌঁছে যাব।
এখানেই শেষ করছি। প্রণাম হই।
আপনাদের আশায় পথ চেয়ে বসে আছি।
ইতি
নিবেদক
শ্রী গঙ্গাধর মাজি

ক্রিয়ায় ফেরা

আবার সেই ক্রিয়ার কথায় ফিরে যাই।

ডাকা

ফেরিওলাকে ডাকো। মেঘ ডাকছে। ঘুমোলে ওর নাক ডাকে। মনে মনে ভগবানকে ডাকো। আমি নো-ট্রাম্প ডেকেছি। ক্লাসে নাম ডাকলে উঠে দাঁড়িয়ো। তোমার ভালো-নাম কি সুব্রত? আর ডাক-নাম? ওর খুব নামডাক। এখন পড়ছি, কেউ যেন না ডাকে। সবাইকে ডেকেডুকে বসাও।

থাকা

এ বাড়িতে কারা থাকে? আমি কারও কথায় থাকি না। তোমার কিছুই মনে থাকে না। বাড়িতে ওর থাকার কথা। সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়। থাক, খুব হয়েছে। থাকতে থাকতে সয়ে যাবে। থেকে থেকে ওর যে কী হয়। বলছিলাম কী, যাক গে। এসব নোংরামিতে থাকতে নেই।

লাগা

গান আমার ভালো লাগে। কোথায় আগুন লাগল? ছাড়ো, আমার লাগছে। লেগে পড়ে এবার কাজটা করো। এ বই আমার কাজে লাগবে না। ওর সঙ্গে লাগতে যেয়ো না। ঘাটে নৌকো লাগল। দেখি কেমন টিপ, গাছে লাগাও তো। লোকের পিছনে লাগা ওর স্বভাব। লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন। লেগে থাকো, হাল ছেড়ো না। ওর মনে লেগেছে। লাগ-লাগ করে দুজনে লেগে গেল।

রাখা

টেবিলে খাবার রাখা আছে। যারা হিসেবি, তারা রেখে খরচ করে। রাখে হরি, মারে কে। ছেলেটি তার বাপের নাম রেখেছে। অনেকেই কথা রাখে না। ওর কোনও রাখঢাক নেই। রাখো ওসব কথা। নিজেকে ধরে রাখার নামই ধৈর্য। যা চোরের উপদ্রব, বাড়িতে কুকুর রাখা ভালো। তিনি সব কিছুর ওপর চোখ রাখেন। যাকে রাখো সেই রাখে।

ভুতের বেগার

ছেলেবেলার কানামাছি খেলায় কাউকে ছুঁতে না পারলে যে অবস্থা হত, বুড়ো বয়সে চণ্ডীমণ্ডপের আসরে বসে আমার এখন সেই দশা।

আবার, নাচতে নেমে উঠোনের দোষ দিয়ে যাতে আমি সরে পড়তে না পারি, সেদিকে 'কর্মক্ষেত্র'র কড়া নজর।

আমাকে বলভরসা দেবার জন্যে সম্পাদক মশাই একটি বই আর একটি পত্রিকা পাঠিয়েছেন। বই বলতে ঢাকার বাংলা অ্যাকাডেমি প্রকাশিত 'প্রশাসনিক পরিভাষা'। সেইসঙ্গে দেবাশিস সেনগুপ্ত সম্পাদিত 'প্রতর্ক'—প্রসঙ্গ বাংলাভাষা।

সুপরিকল্পিত বিষয় আর যোগ্য লেখক নির্বাচনে সম্পাদক যে শ্রম আর নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন, তা এ যুগে বিরল।

পঞ্চাশ বছরের ওপর কেবলই একটা না একটা ওজর দেখিয়ে এ রাজ্যের কর্মক্ষেত্রে বাংলাকে বড় একটা কাছে ঘেঁষতে দেওয়া হয়নি।

পরিভাষার অভাব নাকি এর কারণ।

'প্রতর্কে' এর মুখের মতো জবাব দিয়ে সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন: '... '৬৪ সাল থেকে '৯৬ সাল পর্যন্ত আমি বাংলায় কাজ করেছি। আমার কিন্তু কখনও পরিভাষার বই লাগেনি। আমি যখন বাংলায় চিঠি লিখেছি, ফাইলে মন্তব্য লিখেছি, আমার ওপরের কোনো আধিকারিকের নির্দেশ চেয়েছি, পুরোটাই আমি করেছি আমার নিজস্ব বাংলায়। ইংরিজি লেখার পদ্ধতি অনুসরণ করে আমি কখনও বাংলা লিখিনি। ...'

সনৎকুমার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন কোথায় রয়েছে আসল নষ্টের গোড়া।

ইংরিজিকে সামনে রেখে তার পায়ে পায়ে চলতে চাওয়াই হয়েছে আমাদের কাল। ফলে, পায়ে পা বেধে ক্রমাগত হোঁচট খেয়ে ছেড়ে দে-মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা হয়েছে।

কেন ইংরিজির ভূত আজও আমাদের ঘাড়ে ভর করে থাকবে? আর অনর্থক গুচ্ছের পরিভাষার ভূতের বেগার খাটার কোনও মানে হয়?

এরপর বেশকিছু পরিভাষা ঝেড়ে বেছে দেখব, সোজাসুজি তা সরল বাংলায় বলা যায় কিনা।

সেইসঙ্গে মাঝেমধ্যে কথায় কথায় এসে যাবে বাংলাভাষার নিজস্ব কিছু

ধরনধারণ আর বোলচালের প্রসঙ্গ।

এককালে ধাতু-পাথরে লিখে, ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে, হ্যান্ডবিল ছড়িয়ে, হোর্ডিং দিয়ে রাজ্যের মানুষকে জানাবার যে ব্যবস্থা ছিল, ক্রমশ এখন তার খোলনলচে বদলে যাচ্ছে। তার জায়গায় এখন রেডিও, সংবাদপত্র, টিভি, ফ্যাক্স, ডট-কম। সরকারের খাসতালুক আর জনসংযোগ— দুটি ক্ষেত্রেই এর ছাপ পড়েছে। ভাষার লিখিতপড়িত রূপটা আজ আর একমেবাদ্বিতীয়ম নয়। লেখাপড়ার পাশাপাশি স্থান পাচ্ছে দেখা, শোনা, বলা।

কাজের বাংলা এখন তরবেতরের। সেইসঙ্গে মুখের ভাষার কদর বাড়ছে। নমুনা হিসেবে কিছু পরিভাষা নেওয়া যাক।

বৈষয়িক প্রয়োজনে যেটা যেখানে লাগসই, সেখানে সেই শব্দ ব্যবহার করলেই তো হয়। যেমন:

উপশম, কমানো, ছুট, বাদ। সংক্ষেপ, সংক্ষিপ্ত, সাঁট। দুষ্কর্মের দোসর, সাজিশ। স্থগিত, মুলতুবি, ধামাচাপা, শিকেয় তোলা। অধিমূল্য, যা হার তার বেশি, অতিরিক্ত মূল্য। রদ, বাতিল, নাকচ।

Abate, abbreviation, abet, abeyance, above par, abrogate– এসব ইংরিজি শব্দ মনে না এনেও ওপরের কথাগুলো বেছে নিয়ে জায়গা বুঝে ব্যবহার করা যায়।

এই রকম: অনুপস্থিত, গরহাজির, গ্রামত্যাগী, অনাবাসী (absentee)। সংক্ষিপ্তসার। চুম্বক, বিমূর্ত (abstract)। স্বীকার, স্বীকৃতি, প্রাপ্তি স্বীকার, রসিদ (acknowledgement)। রদবদল, পরিবর্তন-পরিবর্ধন, হেরফের, যোগবিয়োগ (additions and alterations)। সুবিধে, লাভ, ফায়দা, মওকা (advantage)। বিরূপ, প্রতিকূল, অসুবিধাজনক, খারাপ (adverse)। উল্লিখিত, উপরিলিখিত, উপরোক্ত (above cited)। অনির্দিষ্টকাল, আপাতত, এখনকারমতো, সাময়িকভাবে (indefinite period)। যথাপ্রস্তাব, প্রস্তাবমতো, যা চেয়েছেন (as proposed)।

বলবৎ, লাগু, চালু (enforce) জ্ঞাত হয়ে যথোচিত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্যে (for information and necessary action)।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে খটকা লাগে। বিশেষ করে, প্রকাশ্যে টাঙানো বিজ্ঞপ্তির নিচে যখন আজ্ঞাকর্তা পদাধিকারের মাথায় লেখা থাকে 'আদেশক্রমে'। এটা বাংলা রীতিবিরুদ্ধ। হওয়া উচিত 'আদেশদাতা' 'নির্দেশক' বা তার সমার্থক কোনও শব্দ।

এইভাবে বিজ্ঞাপনে বলা হয় 'সহযোগিতায়', 'অভিনয়ে', 'কণ্ঠসঙ্গীতে'।
মনের কোণে থাকে ইংরিজি 'in' শব্দ।
ঢোকা, বেরোনো; ভেতর, বাইরে; প্রবেশ, প্রস্থান। (in, out)।
'শেয়ালদা পর্যন্ত' (Upto Sealdah)। ছাড়বে, পৌঁছুবে (to and from)।
টালা থেকে টালিগঞ্জ (from, to)।
ইংরিজি আর বাংলা। দুটো আলাদা ভাষা। নিয়মকানুনও আলাদা। বাংলার ওপর ইংরিজির জোর খাটানো চলবে না।
মনের যে ভাবটা বাইরে প্রকাশ করব, সেটা যেন ধোঁয়াটে না হয়। ঘোরপ্যাঁচ যা থাকে। বলব এমনভাবে, যাতে কাজ হয়।
ইংরেজ শাসনের খোলনলচে বদলে এদেশে স্বাধীন প্রজাতন্ত্র পত্তনের মূল লক্ষ্যই হল লোকে যাতে তাদের হারানো ক্ষমতা ফিরে পায়। ইংরেজের নকলনবিশি দিয়ে তা হওয়ার নয়। কাজের ধরনেও তাই কথার শাক দিয়ে মাছ ঢাকা চলবে না।
পুরোনো আমলে চিঠিপত্রে যেসব আদবকায়দা প্রচলিত ছিল, তার গোড়ায় থাকত প্রভু-ভৃত্যের উত্তম-অধম সম্পর্ক। উদ্দিষ্টের আগে পরে 'শ্রীল শ্রীযুক্ত' 'মহামান্য' 'মহামহিম' 'বাহাদুর'— কত কী ঘটাপটা। আর পত্রদাতা? শতকোটি প্রণামান্তে এক 'দীন' 'অধম' 'বিশ্বস্ত ভৃত্য' 'অনুগত সেবক'।
এসব ছেঁদো কথার পাট যে একেবারে উঠে গেছে, আজও তা বলা যায় না। বাঁধাবুলির কারবারিদের ধরে বকলমে লেখানো ছাড়া সাধারণ মানুষের আজও গতি নেই।
তাছাড়া, চেয়ারে-বসা মানুষেরা নিজেদের ছোটবড় সাহেব ভেবে নিয়ে সাবেকি চালচলনগুলোকেই জীইয়ে রাখে।
দেখতে হবে, সাহেবিয়ানার জায়গা যেন দখল করে না বসে বাবুয়ানা।
'কর্ম সংস্কৃতি', 'মূল্যবোধ', 'দায়বদ্ধতা' যেমন ইংরিজিপ্রসূত, তেমনই 'মিলিজুলি', 'সমঝোতা'ও বাংলায় বেমানান।
'কালচার' বোঝাতে 'সংস্কৃতি' কথাটা বেছে নেওয়া হয়েছে। 'কালচার'-এর মূলগত ভাব কর্ষণ। তাই কেউ কেউ চেয়েছিলেন 'কালচার'-এর বাংলা হোক 'কৃষ্টি'।
'সংস্কৃতি' শব্দটা আমরা উঠতে বসতে ব্যবহার করি না। যাদের কাছে ওটা 'কালচার'-এর সমার্থক, শুধু তারাই তার সমার্থ বোঝে।

'সংস্কৃতি' না বলে কর্মের সঙ্গে আচার, আচরণ, চর্যা, নিষ্ঠা, কৃত্য ধরনের কোনও পদ জুড়ে নেওয়া যায় নাকি? সদ্‌বৃত্ত, স্বভাব, সদাচার অর্থে 'শীল' শব্দটিও এ প্রসঙ্গে বিবেচ্য হতে পারে। যেটা বলতে চাই, সেটা যেন অনর্থক ইংরিজির আওতায় না ঢাকা পড়ে।

'মূল্যবোধ'-এর পিছনে আছে 'ভ্যালুজ'। ভেঙে বললে দাঁড়ায় 'ন্যায়-অন্যায় বোধ'। 'ন্যায়নীতি'র পিছনে আছে নেওয়া না-নেওয়া। যা নিই তা মূল্যবান, যা নিই না তা ফেলনা। বাংলায় বহু ব্যবহারে 'মূল্য' শব্দটা কদর, দর, দাম, টাকাপয়সার প্রায় সমার্থক হয়ে যাওয়ায় 'মূল্যবোধ' শব্দটিও ইংরিজির ছায়া হয়ে নৈতিকতার ভাবচ্ছবিকে ঝাপসা করে। জানি না, আর কারও তা মনে হয় কিনা।

'দায়বদ্ধতা'ও এমনই এক ছায়া-শব্দ। আড়ালে আছে ইংরিজি 'কমিটমেন্ট'। 'দায়' শব্দটি অনেকার্থক। তবে ভার, বোঝা, দেনা, ঠেকা— এই অর্থগুলোই বহুল প্রচলিত। 'দায়বদ্ধতা'র মধ্যে আছে একটা বাধ্যবাধকতার ভাব। স্বতঃপ্রণোদিত নয়। করতে হয় তাই করা। যা 'কমিটমেন্ট'-এর মনোগত অর্থ নয়। ফলে, 'দায়বদ্ধতা'র মধ্যে লগ্নতা, লিপ্ততা, জড়িত হওয়ার ভাব ফুটে না উঠে ঝঞ্ঝাট ঝামেলার ভাবটাকেই উশকে দেয়।

পোশাকি আর আটপৌরে

কথাটা হল, যতদূর সম্ভব আটপৌরে বাংলাকে কাজে লাগানো।

'দৃষ্টি আকর্ষণ'-এর ইংরিজি গন্ধটাকে অনায়াসে মেরে দেওয়া যায় যদি 'নজরে আনা' বলা হয়।

'প্রার্থনা মঞ্জুর'-এর বদলে 'অনুরোধ রক্ষা' কিংবা 'চাহিদা পূরণ' বললে সৌজন্যে প্রকাশ পায়।

রবীন্দ্রনাথ যাকে 'বাহন' (শিক্ষার বাহন) বলেছিলেন, তার জায়গায় এখন বহুলপ্রচলিত শব্দ 'মাধ্যম'। অবশ্যই শব্দটি ইংরিজি 'মিডিয়াম'-এর বাংলা। শব্দটি এখন আরও ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করা হচ্ছে। 'ম্যাস মিডিয়া'কে বলা হচ্ছে 'গণমাধ্যম'।

এর মধ্যে কিছু কথা থেকে যায়।

'গণমাধ্যম' আদৌ জনগণের বাহন নয়— জনমুখী বা লোকায়ত বাহন। হয় সরকার, নয় শিল্পোদ্যোগীরা এর মারফত তাদের বার্তা ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়।

উত্তম-মাধ্যম

'চিঠির মাধ্যমে আমাদের আলাপ' না বলে, অনায়াসে বলতে পারি 'চিঠির ভেতর দিয়ে'। 'চিঠির সূত্রে', চিঠি মারফত' কিংবা 'পত্রযোগে'। 'চিঠিতে'ই তা নয় কেন?

রাজনীতির ক্ষেত্রে বেশ কিছু কথাবার্তা এসেছে রণং-দেহি ভাব থেকে। যেমন: লড়াই, ক্যাম্পেন, ক্যাডার, স্কোয়াড, ব্রিগেড, ইউনিট, অভিযান, বাহিনী। এসবের চলন বাংলাতেই বেশি হয়েছে। সে তুলনায় দক্ষিণ ভারতে বোধহয় কম। যাত্রা, সঙঘম, জাঠা— এসব দক্ষিণে বেশি চলে।

ইদানীং অবশ্য বাংলায় স্ট্রাইক-এর বদলে ধর্মঘট আর বন্‌ধ বেশি চলছে। ডেমনস্ট্রেশন, মিছিল, অভিযান-এর জায়গা নিচ্ছে পদযাত্রা।

বিপ্লবকে বরাবরই আমরা বলেছি 'ইনকিলাব'। সহযোদ্ধাকে কমরেড। সংসদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাসী হওয়ার পর বিপ্লব আর সশস্ত্র অভ্যুত্থান-এর ব্যবহার কমে এসেছে। 'ভেঙে-দাও গুঁড়িয়ে-দাও', 'নিপাত যাক', 'কবর দাও'য়ের গরম ভাবও কিছুটা জুড়িয়ে এসেছে।

ইংরিজিজ্ঞান অবশ্য সবার সমান নয়। কম-জানাদের মধ্যে একটু বেশি করে দেখানোর ঝোঁক থাকে। তেমনই বনেদি ভাব দেখাতে কেউ কেউ 'টেব্‌ল্' 'গ্লাস' 'স্টেশন' 'আ' 'দ্য' বলে নিজেদের জাত বুঝিয়ে দেন। বলেন 'নম্বর' নয়— 'মার্ক্‌স্'। 'পাশ' নয় 'পাস্'।

ছেলেবেলায় বাবার বন্ধুদের মুখে, প্রচুর শুনেছি, 'ফাদার', 'ওয়াইফ', 'ইয়েস্, ইয়েস্', 'বেগ্-ও-পার্ড্‌ন্', 'সার্টেন্‌লি', 'আপন্‌গড্ বলছি', 'নেম্-সেক্'। এখনও শুনি 'বস্', 'ব্রেকফাস্ট', 'ফ্রেন্ড', 'কল্‌শো', 'স্পন্সর', 'প্রোমোটার', 'স্লোগান'।

আমাদের বাংলা কথায় বড় বেশি ইংরিজির মেশাল থাকে। একবার এক আড্ডায় আমরা কয়েকজন চাপা গলায় নিজেদের মধ্যে বাংলায় কথা বলছিলাম। সেই সময় পাশ থেকে এক বিদেশি সাহেব বলে উঠেছিল, 'আমি কিন্তু সবই বুঝতে পারছি'।

আমরা গ্লানি-কে 'গ্লানি' বললেও, 'গ্লাস'কে বলি 'গেলাস'। 'ক্লীব', 'ক্লেদ', 'ক্লেশ', 'ক্লান্তি' বলতে পারলেও কারও কারও মুখে 'ক্লাস' কেন 'কেলাশ', 'ক্লিপ' কেন 'কিলিপ', 'ক্লাব' কেন 'কেলাব' হয়, ভাষাতাত্ত্বিকেরা তার হদিশ জানেন।

একই বাংলাভাষা, তবু তার মধ্যেও কতরকম ইতরবিশেষ। অঞ্চলভেদ, সামাজিক স্তরভেদ, বৃত্তিভেদ, ধর্মাচরণের প্রভেদ, সেইসঙ্গে উচ্চারণ বৈষম্যে মুখের ভাষায় বিস্তর মিল-অমিল। অশন-বসন, পোশাক-পরিচ্ছদ, ব্যক্তিনাম, আত্মীয়-সম্পর্ক, উৎসব-পরব, ঈশ্বর-বিশ্বাস— এসব আশ্রয় করে একেক কোঠায় আমরা ভাগ হয়ে যাই। মুখের শব্দই আমরা কে কী তা শনাক্ত করে দেয়।

একসময়ে মনে করা হত, সাধুরীতির গদ্যই সারা বাংলায় গ্রহণযোগ্য। আমরা কম বয়সে স্বদেশি নেতাদের 'করিয়াছি', 'বলিয়াছি' বলে মাঠেঘাটে বক্তৃতা দিতে শুনেছি। এখন সেসব ক্রিয়াকাণ্ড বিলকুল বদলেছে। এমনকী পাঠ্যবইও আগাগোড়া চলিত বাংলাতেই লেখা হচ্ছে। আগে যেসব শব্দকে পতিত করে রাখা হত, আজ আর টুলোপণ্ডিতদের শুচিবাই সেসব ঠেকাতে পারছে না।

নিচের মানুষ ওপরে উঠে এসে বাংলা ভাষার ছাঁদ বদলে দিচ্ছে।

যে ভাষা সজীব, তা কখনই এক জায়গায় ঠেকে থাকে না। ঠাকুরদা নাতিকে বলেন, 'আজকাল তোরা যে কী ভাষায় কথা বলিস?' ঠাকুরদার ভাষা সম্পর্কে নাতিদেরও সেই একই অনুযোগ। পুরুষ-পরম্পরায় ভাষার বহিরঙ্গ বদলায় বটে, কিন্তু কাঠামোটা ঠিকই থাকে। ভাষার ধাত বদলায় না, শুধু শব্দের নড়চড় হয়।

যুগ যুগ ধরে দেশবিদেশের কত রকমের মানুষ এসে এখানকার ভাষায় তাদের টিপছাপ রেখে গেছে, তার সম্পূর্ণ হদিশ পাওয়া সম্ভব নয়।

নৌকোর পাল আর নিশানকে মারাঠীরা বলে 'বাওটা'। চট্টগ্রামের গ্রামাঞ্চলেও 'বাওটা' শব্দ শুনেছি। কেননা বোম্বাইয়ের সঙ্গে চট্টগ্রামের ছিল জলপথে বহুকালের যোগাযোগ।

১৯১৪ সালের জেলা গেজেটিয়ারে মেদিনীপুরের দুটো গ্রামের উল্লেখ ছিল। দুটোই ছিল নাকি গুজরাতিভাষী গ্রাম।

বাঁকুড়ায় এমন জনবসতি আছে, যেখানকার বাসিন্দাদের পূর্বপুরুষেরা ছিলেন দক্ষিণের দ্রাবিড়ভাষী।

বিজয়চন্দ্র মজুমদারের মতে, শুধু শব্দ গ্রহণে নয়, কাব্য-প্রকরণেও বাংলাভাষায় দক্ষিণের দাক্ষিণ্য কম নয়।

একবার কাগজে পড়েছিলাম, হিন্দিভাষী উত্তরপ্রদেশের অগ্রগণ্য নেতা

বহুগুণার পূর্বপুরুষেরা নাকি ছিলেন বন্দ্যোপাধ্যায় পদবিযুক্ত প্রবাসী বাঙালী। সত্যি মিথ্যে জানি না, কাগজে পড়েছি কর্নাটকের দুটি গ্রামে নাকি লোকের কথা বলার ভাষা বাংলা।

ক্রিয়াকাণ্ডজ্ঞান

কথায় কথায়, অনেক দূর এসে পড়েছি।
এবার আবার সেই পুরোনো ক্রিয়াকাণ্ডে ফেরা যাক।

ওঠা

আমি খুব সকালে উঠি। ফুলকপি সবে বাজারে উঠেছে। ওর এখন দাঁত ওঠার বয়স। তোমার কি চোখ উঠেছে? ছেলেটা এবার ক্লাসে উঠতে পারেনি। বেলা হল, এবার উঠতে হয়। গরম জলে দিলে জামার রং উঠে যাবে। লিগে এবার ওঠাউঠি বন্ধ। নতুন আইনে ভাড়াটে ওঠানো সহজ হবে। উঠে পড়ে লাগা। উঠতি। উঠবন্দী। উঠকিস্তি।

খাওয়া

এই খেয়েছে, লোকটা আমাকে দেখতে পেয়ে গেছে। ডাঙায় উঠে মাছটা খাবি খাচ্ছে। মা আদর দিয়ে ছেলের মাথা খেয়েছে। বড়বাবু ভালোরকম টাকা খেয়েছে। ওকে আমি ঘোল খাইয়ে ছাড়ব। পরের মুখে ঝাল খাওয়া ঠিক নয়। ব্যবসায় ও বড়রকমের চোট খেয়েছে। এত গাল খেয়েও ওর শিক্ষা হল না।

খোলা

কবে ইস্কুল খুলছে? কী হয়েছে খুলে বলো। সেদিন আমরা প্রাণ খুলে হেসেছি। ভিজে জামা খুলে ফেলো। তোমার জন্যে সবসময় আমার দরজা খোলা। উনি খোলা মনের মানুষ। এখন ওর চেহারা খুলেছে। এবার এর জট খুলতে হবে।

চলা

ঘড়িটা চলছে না। এতে চলবে না, আরও চাই। তার সংসার না চলার মতো। এ রাস্তায় চলা দায়। লোকটার চাকরি চলে গেছে। এ টাকা বাজারে চলবে না। ওকে ছাড়া আমার চলে না। কথা চলছে, দেখা যাক কী হয়। অকালে উনি চলে

গেলেন। ওসব পুরোনো হয়ে গেছে, এখন চলে না। আজ তাহলে চলি।

ছাড়া

ট্রেন এখুনি ছাড়বে। আমি কাউকে ছেড়ে কথা বলি না। ওর কথা ছাড়ো। ওর জ্বর ছেড়ে গেছে। দেখে নিও, ও সহজে ছাড়বে না। ওদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। চৈত্রের সেলে ভালো ছাড় দিচ্ছে। আসামী জামিনে ছাড়া পেয়েছে। ডি ভি সি জল ছেড়েছে।

ডাকা

আকাশে মেঘ ডাকছে। এতক্ষণে ওর ডাক পড়েছে। ওপর থেকে এবার ওঁর ডাক এসেছে। কখন থেকে ডাকছি, কারও সাড়া নেই। ওকে ডেকে তোলো। উনি হঠাৎ আমাকে ডেকে পাঠালেন। অত ডাক ছেড়ে কাঁদার কী হল? সবাইকে ডেকেডুকে নিয়ে এসো। পেট ডাকা। নাক ডাকা। কু ডাকা।

তোলা

এত ভারী যে, তুলতে পারছি না। ফুল তুলছে কে, বারণ করো। ওঁকে বাসে তুলে দিয়ে এলাম। লেখক এ বিষয়টা চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। মামলা করে ওরা ভাড়াটেকে তুলে দিয়েছে। কথাটা তুলতেই সভায় শোরগোল পড়ে গেল। হাই তোলা। পটল তোলা। সুর তোলা। কাপড়ে ফুল-তোলা। মাথায় তোলা। গায়ে তোলা। হাত তোলা। পা তোলা। তোল্লা দেওয়া। জল তোলা। শিকেয় তোলা।

জলপানি

'জল' বলতে গিয়ে ষাট বছর আগের পুরোনো একটা অস্বস্তিকর স্মৃতি মনে পড়ে গেল।

তখন আমি 'জনযুদ্ধে' কাজ করি। মুখ্য সাব-এডিটর। মূর্খও বটে। প্রেসে পাঠাবার আগে একজন সহকর্মীর লেখা 'পানি' শব্দটি কেটে 'জল' করে দেওয়ায় তিনি খুব চটে যান। এ নিয়ে খোঁটাও দেন।

তখন ছিল মুসলিমপ্রধান অবিভক্ত বাংলা। 'জল' ছিল সংখ্যালঘু আর 'পানি' ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠের শব্দ।

দেশভাগের পর বাংলাদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠের 'পানি' শব্দটাই চলছে।

এ-বাংলায় 'জল'।
এখন মনে হয়, সেদিন 'পানি' কেটে 'জল' করাটা বোধহয় ঠিক হয়নি। তবু তখনও 'জলপানি'তে ছিল দুইয়ের যোগফল। 'স্কলারশিপ'-এর সমার্থে যা চলত। এ-বাংলায় 'জলপানি' শব্দটাও এখন চোখে পড়ে না।
সংখ্যালঘুদের অনেক মুখের কথাই এড়িয়ে গিয়ে এই একদেশদর্শিতা বাংলাভাষায় লঘুগুরুর বনিবনায় বিঘ্ন ঘটাচ্ছে না কি?
রুশভাষায় এডিটরকে বলে 'রিডাক্টর'। যিনি ছেঁটেকেটে দেন।
আশা করছি, কর্মক্ষেত্র সম্পাদক কাঁচি চালিয়ে আমার কথাগুলোকে একটু ভদ্রস্থ করবেন।

কান টানলে মাথা

কাগজে 'লঘু লিপি' শিরোনাম দেখে একটু ধাঁধায় পড়েছিলাম। পড়ে বুঝলাম আসলে শর্ট-হ্যান্ডের কথা বলা হচ্ছে।
খবরের মোদ্দা কথা হল, বাংলায় শর্ট-হ্যান্ডের ওপর লেখা একটি বই প্রকাশ করা নিয়ে সরকারি স্তরে একটা টালবাহানা চলেছে। কেন কী বৃত্তান্ত, এসব খোলসা করে কিছু বলা হয়নি।
হয়তো এর উপযোগিতা নিয়ে সংশ্লিষ্ট মহলে দ্বিধা আছে। বিশেষ করে, আজ যখন মুখের কথা টেপ-রেকর্ডারে ধরে রাখার সহজ রাস্তা রয়েছে।
বাংলা পরিভাষার কয়েকটি বইতে শর্ট-হ্যান্ডের এই কটি প্রতিশব্দ চোখে পড়ল: লঘু লিপি, সংকেত লিপি, সাঁট লিপি, রেখাক্ষর। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় হিন্দি নির্দেশালয় অনুমোদিত পরিভাষা হল 'আশু লিপি'। সাদাসিধে সাঁটে লেখাই আমার বেশি পছন্দ।
শুধু শর্ট-হ্যান্ড নয়, বাংলা টাইপরাইটারের ক্ষেত্রেও হয়তো এ প্রশ্ন উঠতে পারে।
আমার ধারণা, বাংলাভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্র আরও প্রশস্ত করে ক্ষতি থেকে বরং লাভের দিকে আমরা পা বাড়াতে পারি।
সরকারি কাজ আর আইন-আদালত ছাড়াও বাংলাকে কাজে লাগানোর আরও নানা রাস্তা খুলে দিতে হবে। এ নিয়ে আগে আমি তার কিছুটা আঁচ দেওয়ার চেষ্টা করেছি। যেমন: অনুবাদক, দোভাষী, সিনেমা-টিভিতে বাংলায় ডাবিং, পাঠ্য এবং চোখে-পড়ানো কানে-তোলা বিজ্ঞাপন, ওষুধ

আর পণ্যসামগ্রীর সঙ্গে তথ্যযুক্ত লেখা। এইভাবে বাংলাভাষাকে আরও বেশি কাজে লাগানো। অনেক দেশেই বেতারে বাংলায় সম্প্রচার করা হয়। বিদেশের টিভিতেও তা হতে পারে।
কান টানলে যেমন মাথা আসে, বাজার ধরতে গেলেও তেমনই মুখের ভাষার দরকার পড়বে।

ক্রিয়াকলাপ

এরপর আবার সেই ধামাচাপা দেওয়া ক্রিয়াকলাপে ফিরে যাই।

থাকা

আমি এখানে থাকতে চাই না। এই সময় ও থাকবে বলেছিল। থাক, খুব হয়েছে। তুমি থাকতে কী করে এমন ঘটল। ওর থাকার মধ্যে একটা টিনের ভাঙা সুটকেস। তুমি যেন ওসব গণ্ডগোলের মধ্যে থেকো না। প্রাণ থাকতে আমি তা হতে দেব না। এই বয়সে আর থাকা না-থাকা। থাকগে সেসব কথা।

দেওয়া

আজ-দেব কাল-দেব করে লোকটা কেবলই ঘোরাচ্ছে। আমার কথায় কান দাও। মন দিয়ে কাজ করো। ধরা না দিয়ে ওর উপায় নেই। দিয়ে থুয়ে তোমার কিছু থাকবে? মেয়ের বিয়েতে দিতে হয়েছে প্রচুর। গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ানো চলবে না। এবার একটু কাজে গা দাও। পরকে দিয়ে দিয়েই সে ফতুর। এসব বুদ্ধি দিচ্ছে ওই প্যাঁচালো লোকটা।

ধরা

আর কাউকে না পেয়ে একজন নিরীহ মানুষকে পুলিশ ধরেছে। ধরো, তুমি লটারিতে এক লাখ টাকা পেলে। অত জিনিস সুটকেসে ধরবে না। কাকে ধরলে কাজটা হয়, বলতে পারেন? ছেলেটাকে একটু ধরো, আমি ততক্ষণে গা ধুয়ে আসি। এবার তোমরা গান ধরো। পড়ার নাম করলেই অমনি ওর মাথা ধরে। হাঁটতে হাঁটতে পা ধরে গেছে। গাছে কুঁড়ি ধরেছে। মেল ট্রেন এখানে ধরবে না। অনেক হাতে পায়ে ধরে তবে নিষ্কৃতি পেলাম।

বাধা

বড়শিতে মাছ বেধেছে। শেষকালে একটা যুদ্ধ না বাধে। ও চেয়েছিল

আমাদের মধ্যে ঝগড়া বাধাতে। ওঁর কাছে আমার যেতে কেমন যেন বাধো-বাধো ঠেকছে। পায়ে পা বেধে লোকটা আরেকটু হলেই উল্টে পড়ত। ওর সাধে বাধ সাধা উচিত নয়।

বাঁধা

পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে সে রওনা হল। ওখানে বাঁধ না বাঁধলে আবার বন্যা হবে। সামনের স্টপে বাসটা বাঁধতে বলবেন। কোমর বেঁধে কাজে লেগে যাও। আমি কিছু করতে পারব না, আমার হাত-পা বাঁধা। ছাপা শেষ, এবার বই বাঁধাই হতে যাবে। কুকুরটাকে বেঁধে রাখো। বাবার ছবিটা বাঁধাতে দিয়েছি। ঘাটে নৌকো বাঁধতেই লাফ দিয়ে আমরা নেমে পড়লাম। আমি গান বাঁধব, তুমি সুর দিও। বাঁধা বুলি। বাঁধা মাইনে। দাঁত বাঁধানো। আইনের বাঁধাবাঁধি থাকায় যে কেউ যা ইচ্ছে তাই করতে পারে না।
এর আগে, কথায় কথায় এসে গিয়েছিল, 'জলপানি'র প্রসঙ্গ।

হাত বাড়াতে হয়

পশ্চিমবাংলায় ধর্মীয় সংখ্যালঘুর কথা উঠলেই আমাদের জিভের ডগায় দুটি নাম এসে যায়— হিন্দু আর মুসলমান।
কে হিন্দু? কে মুসলমান?
অভিজিৎ সেনের 'কলাপাতা' গল্পে এ নিয়ে একটা মজার ঠোকাঠুকি আছে। হানিফ মাস্টারের খোঁচা মেরে কথা বলা স্বভাব। ঘটনাস্থল গ্রামের ব্যাঙ্ক। ব্যাঙ্ককর্মী শিবু আবার গোঁড়া হিন্দুত্ববাদী। তাকে একহাত নেবার জন্যে হানিফ হিন্দুর সংজ্ঞা দেন এই বলে— 'যারা অহিন্দু নয় তারাই হিন্দু'। শিবু পাল্টা এই বলে তার শোধ নেয়— মুসলমান কে? না, যারা কলাপাতার উল্টোদিকে ভাত খায়।
গল্পের বিষয়বস্তু অন্য। ঠোকাঠুকির প্রসঙ্গটা এসেছে নেহাৎ কথাচ্ছলে। আমার মনে হয়, আমরা চাই না চাই, বাংলাভাষায় এই পিঠোপিঠির ভাবটা কিন্তু রয়েই গেছে।
অন্য অহিন্দুদের আমরা তো হিসেবেই আনি না।
বাংলাভাষী বৈষ্ণবের সংখ্যা কি কম? তাদের শব্দভাণ্ডার, বাচনভঙ্গি। তার মধ্যে কত যে মণিমুক্তো আছে, সমরেশ বসু কালকূট নাম নিয়ে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন 'কোথায় পাব তারে' বইতে।

সাঁওতালি, রাজবংশী— এমনই এ-অঞ্চলে সে-অঞ্চলে ছড়ানো মুখের ভাষার আরও কত শব্দসম্পদ আমাদের অনেক খাঁই মেটাতে পারে। ঘরের মানুষদের পর করে রেখে তা হওয়ার নয়।

প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্যের 'টিকা টিপ্পনি' গ্রন্থের পরিশিষ্টে ছিল এই রকমের একটি প্রকল্পের রূপরেখা। কাজটা একার নয় বলেই হতে পারেনি। এ রাজ্যের ক্ষমতাবান মানুষেরা একটু কাঁধ দিলেই সে কাজ হাসিল হতে পারে।

বাংলায় সরকারি কাজ চালানো নিয়ে কথা হচ্ছিল। আবার সেই প্রসঙ্গে ফিরে যাই। পরিভাষার ওজর তুলে এ ব্যাপারে বাংলাভাষার পাশ কাটিয়ে যাওয়ার ঝোঁক আজও যায়নি।

আমার মতে, বরং বাংলায় পরিভাষাকে যথাসম্ভব পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে তাতে লোকসানের চেয়ে লাভ বেশি।

ব্যাপারটা হাতে-কলমে কী দাঁড়ায় দেখা যাক।

পরিভাষা মাথায় থাক

ইংরিজির সমান্তরাল কিছু বাক্য নিচে বাংলা করে দেওয়া হল—

এখন থাক, পরে দেখা যাবে। বিষয়টা আপাতত স্থগিত থাক। এখুনি সিদ্ধান্ত নেওয়ার দরকার নেই। মুলতবি থাক।

অনুরোধ রাখা হোক। আর্জি মঞ্জুর করা হল। দাবি স্বীকৃত হল।

উপরোক্ত (ক) বিষয়ে আমার সম্মতি আছে।

নির্দেশ অনুযায়ী আপনাকে জানাচ্ছি। আপনাকে জানাতে বলা হয়েছে।

সেইমতো। সেই অনুযায়ী। তদনুসারে।

কারণ। যেহেতু। যে অবধি। যে পর্যন্ত না।

তার ওপর। তা ছাড়া আছে।

(কারো) ইচ্ছানুক্রমে। মতে মত দিয়ে।

অনুমোদন। সমর্থন বহাল। বলবৎ। নিশ্চয়ীকৃত করা।

সে সম্বন্ধে। সে বাবদ। সে সংক্রান্ত।

ফলত। ফলস্বরূপ। পরিণামে।

পরামর্শক্রমে। উপদেশানুযায়ী।

তার জের টেনে। খেই ধরে। সূত্র ধরে। টেনে নিয়ে বলা।

বিপরীতে যাওয়া। লঙ্ঘন করা। উল্টো কাজ।

যথাকালে। কালক্রমে। নিয়মানুযায়ী। নির্দিষ্ট সময়ে। কাজ করতে করতে।

অনাদায়ে। খেলাপ হলে। না হলে। খুঁটিনাটি। সবিস্তারে। সবিশদ। খুঁটিয়ে।
চালু। লাগু। বলবৎ।
নির্বিশেষে। সাধারণভাবে। সর্বজনীন। কাউকে বাদ না রেখে।
তাঁর বিবেচনামতো। তাঁর মর্জি অনুযায়ী। তিনি যা ঠিক করবেন।
তার বদলে। তার পরিবর্তে। তার জায়গায়। তার স্থলে।
তেমনি ভাবে। সমান ভাবে। একই রীতিতে। যথারীতি।
থোক টাকা। থোক অনুদান।
অদলবদল। হেরফের। সংশোধন।
যথানুযায়ী। যথাবিহিত। যথোচিত।
একের পর এক। একান্বয়ে। একাদিক্রমে। পরের পর।
সেই অনুসারে। সেই মোতাবেক। সেই বাবদে।
আর সব বিষয়ে। এছাড়া অন্যান্য বিষয়ে।
প্রকারান্তরে। কথার ভাবে। কায়দা করে। স্পষ্টাস্পষ্টি না বলে।
ব্যক্তিগতভাবে। খোদ। স্বয়ং। নিজে।
হাতেকলমে। কার্যত। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে। করে দেখানো। কাজে ফলানো।
সব মিলিয়ে। সর্বমোট। সাকল্যে।
এমন ঘটলে। সে অবস্থায়। সে ক্ষেত্রে। অবস্থা গতিকে।
নির্দেশের অপেক্ষায় থাকলাম। কী করা হবে জানাবেন।

সওয়াল-জবাব

আসর আজ কোথায় বসবে?
চণ্ডীমণ্ডপে? না বটতলায়?
বটতলা বলতেই তো উকিলের কথা মনে পড়ে যায়। আর উকিল বললেই আইন আদালতের কথা।
সেইসঙ্গে কালো কোট। হুজুর, মি-লর্ড, ধর্মাবতার। আসানড়ি। পরচুল।
প্রথম বয়সে জেল খেটেছি বিনা বিচারে। শেষ বয়সে মাঝেমধ্যে কোর্টে যেতে হয় উচ্ছেদের মামলায়।
কাজেই আইন-আদালতের জগৎটা আমার কাছে, বলতে গেলে অধরাই থেকে গেছে।
শুনেছি, এ রাজ্যে নাকি শুরু হয়ে গেছে আদালতে বাংলায় কাজ। যাক, যার

ফাঁসি হচ্ছে সে এবার অন্তত নিজের ভাষায় হদ্দমুদ্দ জানতে পেরে হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে।

মোকদ্দমার শুনানিতে দু-পক্ষের যে চাপান-উতোর হয়, তার মধ্যে থাকে বিধিবদ্ধ শব্দের অর্থ নিয়ে চুলচেরা তর্ক।

খোদ আইনের ভাষাটাই হয় এর উপলক্ষ।

এখানেই হয়ে যাচ্ছে আমাদের গোড়ায় গলদ।

এ রাজ্যে যে আইনটা পাশ হল, সেটা কোন ভাষায় লেখা?

তার ভাষাটা কি ইংরিজি নয়? বাংলায় তার অনুবাদ থাকলেও, দু-পক্ষের কূটকচালিতে কি সে ভাষা প্রামাণ্য বলে গ্রাহ্য হবে?

আইনের লোকদের কাছে আরও শুনেছি যে, থানায় লেখানো এক নম্বর এত্তেলার (এফ আই আর) ওপর নাকি মামলার অনেক কিছু নির্ভর করে।

দেখা দরকার, এ রাজ্যে সব থানায় তা আগাগোড়া বাংলায় হচ্ছে কিনা।

আইনের বয়ান তৈরি হল বিশেষজ্ঞদের কাজ। ব্যবহারশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি ছাড়াও, আইনের আঙিনায় দেশিবিদেশি নির্বিশেষে যেসব বহুপ্রচলিত শব্দ আছে, দরকার বাংলায় তার যথাসম্ভব ঠাঁই করে দেওয়া। কিন্তু সেটা করতে গিয়ে ইতিহাসের ধারাকে ঠেলে পিছনে হটাবার মূঢ়তা যেন আমাদের পেয়ে না বসে।

বজ্র আঁটুনির ফস্কা গেরো

এক্ষেত্রেও উঠবে পরিভাষার কথা।

পরিভাষা নিয়ে অনেক সময় আমরা একটু বেশি রকম ধরকাট করি। নির্দিষ্ট একটি অর্থে তাকে এমনভাবে বেঁধে দেবার চেষ্টা হয়, যাতে এতটুকু না নড়চড় করতে পারে।

কিন্তু চাইলেও পরিভাষার ঘেরাটোপে জ্ঞানবিজ্ঞানকে একঘরে করে রাখা যায় না। সামাজিক চেহারা নিয়ে জীবনচর্চায় তা জড়িয়ে গিয়ে মানুষের আবেগ অনুভূতিতে স্থান পায়।

একটু হাত বাড়ালেই এসব শব্দ আপনা থেকে ধরা দেয়। কোনও হুলিয়া বা গ্রেপ্তারি পরোয়ানার দরকার হয় না।

যেমন :

অকুস্থল। ঘটনা যেখানে ঘটেছে।

মাদকদ্রব্য হল আব্‌কার। যা থেকে আবগারি।

আখিরি। হিসেবনিকেশের শেষ সময়।
আয়েন্দা। যা আসছে। আগামী।
আহেল। খাঁটি। আসল। আনকোরা নতুন।
আলাত। কাজ করবার যন্ত্র। টুল্‌স্‌। টুল্‌বক্স কি 'আলাত বাক্স'?
ইয়াদদস্ত। মেমোরান্ডাম। স্মারকলিপি।
আমুল মামুল। পূর্বাপর যা হয়ে আসছে।
উমরভোর। সারা জীবন।
উমেদ। ভরসা, প্রত্যাশা। তা থেকে উমেদার। প্রত্যাশী। কর্মপ্রার্থী।
আদায় উসুল।
একজাই। একত্র করা।
এক্তিয়ার। অধিকার। ক্ষমতা।
এক্‌রার। স্বীকৃতি। কবুল করা।
একসা। একাকার। একত্র।
এজমালি। যৌথ অধিকার। বারোয়ারি।
এত্তেলা। রিপোর্ট। অবগত করা।
এস্তেমাল। অভ্যাস। ব্যবহার। রপ্ত করা।
ওকালত নামা। উকিলের নিয়োগপত্র।
ওজরদাবি। পাল্টা দাবি।
ওলদে। সন অফ। অমুকের পুত্র।
ওলি। সাপ্লায়ার। জোগানদার। সরবরাহকারী।
কট। শর্ত। কট কোবালা। শর্ত খেলাপ করলে বন্ধকী জিনিস বেহাত হবে— এই প্রতিশ্রুতি।
কাবিলনামা। স্ত্রীধনপত্র।
কলমবন্দী। লিখিত। লিপিবদ্ধ।
কায়েম মোকাম। এজেন্ট। নিযুক্ত প্রতিনিধি।
কারপরদাজ। কর্মচারী। কাজের লোক।
কিতা। খণ্ড। দফা। জিনিস। আইটেম।
খটি। ধানচাল বিক্রির জায়গা।
খাইখালাসি। মালিকের স্বত্ব অক্ষুণ্ণ রেখে উপস্বত্ব ভোগ।
খারিজ দাখিল। নাম পরিবর্তন।
খোদ হাকিমি। অনধিকারীর নিজের ক্ষমতা দেখানো।

গস্ত। খরিদ করা।
গস্তিদার। যে কেনার জন্যে জিনিসপত্তর খুঁজে বেড়ায়।
গুজরত। কাউকে দিয়ে পাঠানো। মারফত।
গোস্তাকি। ঔদ্ধত্য। আদালত অবমাননা।
ঘায়েল। জখম।
চকবন্দী। প্লট-করা জমি।
চকমিলানো। চতুর্দিকে একই ধরনের সমোচ্চ বাড়ির চত্বর।
চুকভুল— ভুল ভ্রান্তি।
ছাড়চিঠি— যে চিঠি দেখালে ছাড় পাওয়া যায়।
জঙ্গলবুড়ি তালুক। যে জংলা জায়গায় কম খাজনায় প্রজা বসতে পারে।

বিজ্ঞাপনের খাঁই

আইন-আদালত খুব হয়েছে। এবার একটু এপাশ ওপাশ করে ঝিঁঝি-ধরা ভাবটা কাটিয়ে ফেলা যাক!

যেসব কাগজ বাংলাভাষার মা-বাপ, তাঁরাও দেখছি ইংরিজিতে লেখা বিজ্ঞাপন সোনামুখ করে গিলছেন।

বাজার কিন্তু এখন হাট-খোলা। আপনার-পর বলে খদ্দেরের কাছে খাতির নেই। দেশের লোককে টানতে গেলে দেশি ভাষাতেই সমঝাতে হবে।

শুধু ভাষা তো নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে দেশের মানুষের আচারবিচার স্বাদ-রুচি সমাজ-স্বভাব।

বিজ্ঞাপনের কর্তারাও জানেন, এমন অনেক কিছুই আছে যা এক দেশেরটা অন্য দেশে কিংবা এক ভাষারটা অন্য ভাষায় চালানো যায় না।

জুতো পরে গির্জায় ঢোকা যায়, কিন্তু মন্দিরে মসজিদে ঢুকতে গেলে জুতো বাইরে রাখতে হবে।

জাতি-ধর্ম-দেশ ভেদে রঙেরও আছে বাছবিচার। শোকপ্রকাশে সাদা আর কালো দুইয়েরই ব্যবহার আছে।

কোথাও হ্যান্ডশেক, কোথাও কোলাকুলি, কোথাও হাতজোড় করে নমস্কার।

এ কাজের যারা কাজী, তারা যদি উদ্দিষ্ট মানুষদের না চেনে, না জানে— তাহলে কেমন করে তাদের মন পাবে?

গোত্রান্তর

এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত কোনও বইতে পড়েছি।

কোনও এক বিজ্ঞাপন কোম্পানিতে কপি লেখার জন্যে একজন নতুন লোক নেওয়া হয়েছিল।

তার লেখার গুণে ওই কোম্পানির বিজ্ঞাপনে মরা গাঙে যেন জোয়ার এল। তাদের বিজ্ঞাপনের প্রশংসায় সবাই পঞ্চমুখ।

কর্তারা যাচাই করে দেখলেন যে, নতুন কপিলেখক সাধারণ মানুষের ভেতর থেকেই উঠে আসায় ঠিক তাদের মতো করেই তাদের মনের কথা ফুটিয়ে তুলতে পেরেছে।

ব্যস্, এরপরই চড়চড় করে তার চাকরিতে উন্নতি। মাইনেও হল আকাশছোঁয়া। উঠে গেল পয়সাওলা অভিজাতদের পাড়ায়। সাধারণ মানুষ যার ধারেকাছে নেই, এমন একটা জীবনযাপনে সে অভ্যস্ত হয়ে পড়ল।

এদিকে আস্তে আস্তে তার বিজ্ঞাপন লেখার ধার ভোঁতা হয়ে এল। দেখা গেল, সে বিজ্ঞাপনে আর আগের মতন লোকে সাড়া দিচ্ছে না।

বিজ্ঞাপনের কর্তাদের তো মাথায় হাত! আবার সেই পুনর্মূষিক অবস্থা।

এটা কিন্তু গল্প নয়। সত্যি।

এবার কয়েকটা ইংরিজিনির্ভর বাংলার নমুনা দিয়ে পাততাড়ি গুটিয়ে ফেলি।

ওপর

আমার ওপর নির্ভর করো না। আমার ভরসায় থেকো না। এই নদীটার ওপর একটা সেতু আছে। এই নদীতে একটা ...। ঘোড়ার ওপর চড়ে সে বেড়াচ্ছিল। ঘোড়ায় চড়ে ...। ছ বছরের ওপর সব শিশুই স্কুলে যাবে। ছ বছরের হলেই শিশুরা ...। ছাদের ওপর একটা প্যাঁচা বসে আছে। ছাদে একটা ...। তোমার ওপর আমার বিশ্বাস নেই। তোমাতে আমার ...। হুগলি নদীর ওপর কলকাতা। হুগলি নদীর তীরে ...।

দিয়ে

আমরা হাত দিয়ে কাজ করি। আমরা হাতে কাজ করি। জল দিয়ে গেলাসটা ভর্তি করো। গেলাসটা জলে ভর্তি করো। লোক দিয়ে চিঠিটা ডাকে ফেলার ব্যবস্থা করো। লোক ডেকে চিঠিটা ডাকে দেওয়ার ...।

পাঁচ পা, সাত ঘোড়া

ব্যাকরণ বললেই ব্যাকরণ সিংয়ের কথা মনে না হয়ে পারে? মনে হয়, শিং দিয়ে এখুনি গুঁতোবে।

কিংবা লাল পাগড়ি মাথায় এক পাহারাওলা, পান থেকে চুন খসেছে কি ধরবে।

ভাষা কীভাবে চলবে সেটা দেখা ব্যাকরণের কাজ নয়। ভাষা কীভাবে চলে, শুধু সেটুকু দেখানোই তার কাজ।

চলতে গেলে পায়ের দরকার। কম করে দুটো পা। যেমন, মানুষের। নইলে চার পা। যেমন, চার পেয়ে জীব। কিন্তু পাঁচ পা? ওটা একেবারেই কথার কথা। যেমন, আমরা বলি, সাপের পাঁচ পা দেখা।

কিন্তু সত্যিই পাঁচ পা আছে বাংলাভাষার। পা বলতে পদ। বিশেষ্য সর্বনাম ক্রিয়া অব্যয় বিশেষণ— এই পাঁচ পদ। এদের নিয়ে হয় বাক্য।

সাতরঙের ঘোড়া নাকি টানে সূর্যের রথ। এ সবই কল্পনা।

কিন্তু বাক্যকে টেনে নিয়ে যায় যে সাতটি ঘোড়া, তাদের বলা হয় কারক। এদের চালায় বাক্যের ক্রিয়া। ইংরিজির সঙ্গে বাংলার এইখানে তফাত। ইংরিজিতে বাক্যের চালক হল নামপদ— বিশেষ্য কিংবা সর্বনাম। বাংলায় কিন্তু ক্রিয়া।

বাংলায় তাই ক্রিয়াকে জিজ্ঞেস করলেই জানা যায়, কে কোন কারক। লোকে দৌড়চ্ছে; ঘোড়া ছুটছে। কে? লোকে। কী? ঘোড়া।

কে-কী, কী-কে, কাকে, কী-থেকে, কোথা-থেকে, কী-দিয়ে, কবে কোথায় কিসে, কার কিসের— ক্রিয়াকে ধরে জেরা করলেই এইসব সাতপাঁচ প্রশ্নের উত্তর মেলে।

বাক্যের মধ্যে এই উত্তরগুলো থাকে বলেই পরস্পরের বোঝাপড়ায় আমরা মুখের কথাকে কাজে লাগাতে পারি।

ভাষা চলে তার নিজের নিয়মে। ব্যাকরণ শুধু সেই নিয়মগুলো খুঁজে বার করে। যে ভাষার যা ধর্ম, সবাইকেই তা মেনে চলতে হয়। দেখে শুনে পড়ে জেনে তা শিখে নিলে তবেই তা কাজে লাগানো যায়।

এক বোঝাতে

এক খণ্ড কাপড়। এক ফালি কুমড়ো। এক গাছা চুল। এক গাছি সুতো।

এক পাটি জুতো। গ্রামে মোটে এক ঘর ব্রাহ্মণ। এক টুকরো মাছ। এক ফোঁটা জল। একতলা বাড়ি। এক কল্কে তামাক। এক সুতো ফাঁক। একবর্ণ না জানা। এক খিলি পান।

একের বেশি

এক আঁটি খড়। এক কাঁদি/ছড়া কলা। এক ঝাঁক পাখি। একগাদা লোক। এক দল পাঠান। এক পশলা বৃষ্টি। একপাল গরু। এক ডজন ডিম। একজোড়া জুতো। এক প্রস্থ কাচের বাসন। একগাঁট কাপড়। এক বস্তা চাল। এক পাটি দাঁত। এক হাঁড়ি ভাত। এক কাঁড়ি টাকা। এক থোলে আঙুর। এক ভাঁড় রসগোল্লা। এক ডেকচি মাংস। এক গা গয়না। এক ঝাড় বাঁশ। এক ঢাল চুল। একরাশ জিনিস। এক লরি মাল। এক গুচ্ছ গোলাপ। এক সার সৈন্য।

কাপড়ের পুঁটুলি। জঞ্জালের ডাঁই। চাবির থোলো। ফুলের গুচ্ছ। আমের ঝাঁকা। বিড়ির বান্ডিল। নোটের তাড়া। টাকার তোড়া। বালির স্তূপ। ছাইয়ের গাদা। কাগজের দিস্তে।

ভর্তি, ভরা, সুদ্ধ যোগ করেও আমরা অনেক বুঝিয়ে থাকি। যেমন: মাঠভর্তি লোক, গা-ভর্তি গয়না। আকাশভরা মেঘ, গোলাভরা ধান। গাঁ-সুদ্ধ লোক, সুদ সুদ্ধ পাওনা।

লাল ফিতে

এবার এই ফাঁকে একটু সেরেস্তার কাজ সেরে নেওয়া যাক।

বিভাগীয় তদন্ত/পদোন্নতি/দায়িত্ব/নির্দেশ/পরিদর্শন।

সংশোধিত খসড়া। অনুমোদনসাপেক্ষ খসড়া। মুসাবিদাটি ঠিক আছে। খসড়া উত্তরটি অনুমোদনার্থে দেওয়া হল।

নজরে আনতে চাই।

এই সময়কালে। এই পর্বে।

যথাসত্বর নির্দেশ প্রার্থনীয়।

লোকসেবা নিবন্ধন। জনসেবার প্রয়োজনে। জনমঙ্গলার্থে।

ফেলে রাখবেন না। দেরি না হয়। কাজে গতি আনুন। রোজকার প্রশাসনিক কাজ।

চিঠিতে তা খোলসা করে বলা হয়েছে।

খেলাপকারীর কাছে কৈফিয়ত চান। কৈফিয়ত তলব করু
তদনুযায়ী কী ব্যবস্থা নেওয়া হল জানান।
ত্রুটি মার্জনীয়।
না হলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
বিবেচনার্থে কী করা যায় দেখবেন।
এর পরের ধাপে এগোবার ব্যবস্থা করবেন।
পড়ে দেখে ফেরত পাঠাবেন।
এই প্রথম নয়, আগেও এর নজির আছে।
প্রেরক। প্রাপক। অবধায়ক। প্রযত্নে।
এমন কোনও বাঁধাধরা নিয়ম নেই।
দায়িত্বভার হস্তান্তর। চার্জ বুঝিয়ে দেওয়া।
ভাতা। ভ্রমণ ভাতা, রাহা খরচ। বিরাম ভাতা, যাত্রাবিরতি ভাতা।
এ বিষয়ে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।
অনুরোধ রক্ষা করা হোক। প্রার্থনা মঞ্জুর করা হোক।
আপাতত স্থগিত থাক। পরে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
লিয়েন। পূর্বস্বত্ব। প্রাগধিকার।

বাঁশবনে ডোমকানা

একটা সময় ছিল যখন যথাসাধ্য চেষ্টা করতাম যাতে বাংলায় বানান ভুল না হয়।

এখন আমি বাঁশবনে ডোম কানা। কেননা নানা মুনির নানা মতে আমার দিশেহারা অবস্থা।

মাঝে বাংলা আকাদেমি চেষ্টা করেছিল হাল ফেরাতে। কিন্তু কথায় বলে, 'বারো রাজপুত তেরো হাঁড়ি। কেউ খায় না কারও বাড়ি।'

ফলে, বাংলা বানানে অরাজকতা কমেনি। বরং আরও বেড়েছে।

অথচ বইপত্রের প্রকাশক, স্কুল কলেজের শিক্ষক, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, নানা বিদ্যার বিদ্বজ্জনদের সংস্থা আছে। দেশ আর দশের স্বার্থে কেন তাঁরা একটা সর্বসম্মত বানানবিধি গড়ে তুলতে পারছেন না?

সরকার বাংলাভাষাকে কাজে লাগাবার জন্যে মাঝে মাঝে নড়েচড়ে বসেন। তেমনই বানানে সমতা আনার জন্যেও তো কিছুটা শোরগোল তুলতে পারেন।

ভাষার ব্যবহারও যে যার মর্জিমতো করে চলেছেন।
রোজকার বাংলা খবরের কাগজ পড়তে গিয়ে এটা আরও বেশি চোখে লাগে। চীন-চিন। সাথে-সঙ্গে। এনকেফেলাইটিস — এনসেফেলাইটিস। ঢেলে সাজা — ঢেলে সাজানো। গাভাসকর — গাওস্কর। শচীন — সচিন। পাটনা — পটনা।
এই জেদাজেদি আর অবনিবনা বাংলাভাষার ঐক্যে প্রতিদিনই ফাটল ধরাচ্ছে। কিন্তু 'অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে?'

অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা

ইংরিজি ভাষায় 'ম্যান'-এর জায়গায় 'পার্সন' বসিয়ে লিঙ্গবৈষম্যের চোট সামলাতে হচ্ছে।
বাংলায় স্ত্রীশিক্ষা আর স্ত্রী-স্বাধীনতার ঢেউ এসে লেগেছে অনেক পরে। ছেলেবেলায় আমরা শুনেছি 'মাস্টারনি'; ক্বচিৎ কদাচিৎ 'ডাক্তারনি'। কিন্তু 'নার্স' বলতেই মেয়ে। ব্যতিক্রম বোঝাতে লিখতে হয় 'পুরুষ-নার্স'।
মাস্টারনিরা হয়েছেন 'শিক্ষিকা' কিংবা 'অধ্যাপিকা'। চিকিৎসার ক্ষেত্রে 'লেডি ডাক্তার'-এর চল কমে আসছে। এখন সোজাসুজি ডাক্তার মিস্ বা মিসেস্ অমুক।
উকিল ব্যারিস্টার ইঞ্জিনিয়ার প্রযুক্তিবিদ সিভিল-সার্ভেন্ট— কোনও ক্ষেত্রেই আজ মেয়েরা পিছিয়ে নেই।
ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চপদে যে মহিলা নির্বাচিত হবেন, তিনি হবেন আমাদের রাষ্ট্রপতি। পতি যদি আমাদের ভাষায় একচেটিয়া পুরুষত্ব হারায়, তাহলে মেয়েরা স্বচ্ছন্দে সভাপতি বা সভাধিপতির পদ অলঙ্কৃত করতে পারবে।
সংস্কৃতের মতো বাংলায় ক্লীবলিঙ্গ নেই। হয়তো একসময়ে বাংলায় স্ত্রীলিঙ্গ-পুংলিঙ্গের নানাবিধ ভেদও উঠে যাবে।
কেননা মানুষের এগিয়ে চলার সঙ্গে ভাষাকেও পা মিলিয়ে চলতে হবে।
ইংরিজিতে বিশেষ আর নির্বিশেষ বোঝাতে 'দি' আর 'এ' বা 'অ্যান' ব্যবহার করা হয়।

টা-টি-খানা-খানি

বাংলায় বিশেষভাবে কিছু বোঝাতে আমরা টা, টি, খানা, খানি, টু, টুকু জুড়ে দিই।

যেমন: টেবিলটা নড়ছে। গায়কটি কে? টাকায় মাত্র দুখানা লুচি। ছুরিখানি ধারালো। একটু বসো। এইটুকু পথ।

রামেন্দ্রসুন্দরের কথায় বলি: 'একটা বলিলে যত বড় জিনিষ বুঝায়, একটি বলিতে তার চেয়ে ছোট বুঝায়, একটু বলিলে আরও ছোট, অর্থাৎ অতি অল্প মাত্র, বুঝায়। পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন নাকি কোন রাজাকে বলিয়াছিলেন, 'তুমি রাজা-টি নও, রাজা-টা; আমিও পণ্ডিত-টি নই, পণ্ডিত-টা'।'

শুনে মনে পড়ে যাবে সেই আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ির ছড়া:

'আমার ছেলে ছেলেটি, খায় শুধু এতটি।
বেড়ায় যেন গোপালটি।
ওদের ছেলে ছেলেটা, খায় দেখ এতটা।
বেড়ায় যেন বাঁদরটা।'

'রামায়ণটা পড়া আছে',— এতে বোঝায় গোটা, আগাগোড়া, সম্পূর্ণ। যেমন, 'মাসটা চলে যাবে।'

সব সময়ে না হলেও, নির্বিশেষ বা কোনও-এক বোঝাতে আমরাও 'এক' বা 'একটা' ব্যবহার করি।

যেমন: 'এক সময়ে এক রাজা ছিল।'

আবার 'একটা কলম দাও লিখি' না বলে বলতে পারি 'কলম দাও লিখি'। 'হাতের কাজটা শেষ করো।' আর 'একথা ওকে বললে? কাজটা ভালো করোনি।' প্রথমটি 'কাজ' আর দ্বিতীয়টি 'আচরণ'।

বহুবচন

একের বেশি বোঝাতে বাংলায় আমরা ব্যবহার করি: গুলো, গুলি, রা, এরা, সমূহ, সমুদয়, সব, সকল, অনেক, বিস্তর, গুচ্ছের, গণ, দল, বর্গ, বৃন্দ, কুল, মালা, শ্রেণী, আবলী, পঙ্‌ক্তি, মণ্ডলী— এইরকম কত কী।

ঢালাওভাবে গুলো, গুলির চল থাকলেও রা বা এরা প্রাণিবাচক শব্দের বাইরে খুব একটা প্রযুক্ত হয় না। যেমন: 'মেঘেরা চলে চলে যায়' (প্রকৃতির পরিশোধ: রবীন্দ্রনাথ)।

ঘরগুলো। ছবিগুলি। শকুনরা। চিলেরা। ভাইসব। বাপসকল। হংসমালা।

গ্রন্থাবলী। পক্ষিকুল। সভাসদবৃন্দ। সৈন্যদল। ব্যক্তিবর্গ। দেবগণ। ভক্তমণ্ডলী। গিরিশ্রেণী। আসনপঙ্‌ক্তি।

অনেক লোক। বিস্তর মাল। গুচ্ছের জিনিস। অনেক, বিস্তর, গুচ্ছের থাকলে বিশেষ্যপদের সঙ্গে বহুবচনের আর কোনও বিভক্তি দেওয়া যায় না, বলা যায় না: অনেক লোকগুলো।

তবে 'অনেক-এর সঙ্গে 'গুলো' যোগ করে বলা যায়: 'অনেকগুলো পাতা পোকায় কাটা'।

এইভাবেই বলা যায়: 'ছেলেগুলো সব গেল কোথায়?'

'সব মোরগেরই' বা 'সব মোরগদেরই মাথায় ঝুঁটি থাকে।'

বহুবচন বোঝাবার আরও নানা উপায় আছে: ধানের আঁটি। ভেড়ার পাল। মাছের ঝাঁক। নোটের তাড়া। কাগজের বাণ্ডিল। কাপড়ের পুঁটুলি। তাসের প্যাকেট। গাছের সারি। ইটের পাঁজা।

জিনিসপত্তর। হিসেবপত্তর। চিঠিপত্তর। আসবাবপত্তর। বিছানাপত্তর। খরচ পত্তর। দলিলপত্তর। পুঁথিপত্তর। খাতাপত্তর।

জোড়ায় জোড়ায়

এছাড়া আছে জোড়া শব্দ।

পুনরুক্তিমূলক: মুঠো মুঠো, বস্তা বস্তা, গোছা গোছা, কলসি কলসি, বালতি বালতি, ঝুড়ি ঝুড়ি, গেলাস গেলাস, লরি লরি। শুধু আধারবাচক শব্দে নয়, মাপ বা ওজনেও বহুত্ব বোঝানো হয়। যেমন: মন মন ধান, টন টন মাল, কিলো কিলো মাছ, লিটার লিটার দুধ, মাইল মাইল রাস্তা।

এছাড়া আছে: মানুষজন, রাজারাজড়া, খেলাধুলো, তাসপাশা, গরুছাগল, পাখপাখালি, খালনালা, জীবজন্তু, ধানপাট, মাঠঘাট, গ্রামগঞ্জ, বাজারহাট, গানবাজনা, যাত্রাথিয়েটার, রাস্তাঘাট, দোকানপাট, লোকলস্কর, পাইকপেয়াদা, হাঁড়িকড়াই, দলিল-দস্তাবেজ, আমিরওমরা, ঘরবাড়ি, তেলসাবান, বসনভূষণ, কামানবন্দুক, গুলিগোলা।

অর্থহীন শব্দও জোড়া দেওয়া হয়: ফলটল, ফুলটুল, চৌকিটৌকি, চোখটোখ, টাকাফাকা, হাঁটুফাঁটু।

এছাড়া গ্রামে গ্রামে, গাছে গাছে, জনে জনে, মুখে মুখে, পাতায় পাতায়, ডালে ডালে— এসব তো আছেই।

বালাই ষাট

এবার টুক করে একটু সেরে নেওয়া যাক সেরেস্তার কাজ।
উপরোক্ত (ক)-তে আমার সায় আছে।
আমি বলতে চাই যে।
আমাকে জানাতে বলা হয়েছে।
আরও কথা এই যে।
এখনই ব্যবস্থা নিন।
অফিস থেকে দেওয়া নোটের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত।
প্রাপ্ত দায়িত্বের অতিরিক্ত।
আপনার উত্তরের অপেক্ষায়।
কেননা। যে অবধি। যে পর্যন্ত।
আগে যা লিখেছি তার জের টেনে।
পাকাপাকিভাবে গৃহীত হয়েছে। এটাই পাকা সিদ্ধান্ত।
সেই অনুসারে। তদনুযায়ী। সেই মতো।
লঙ্ঘন করা। অন্যথা করা।
সবিস্তারে। খুঁটিয়ে। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে।
কাজ করতে গিয়ে। কর্মব্যপদেশে। কাজে হাত দিয়ে।
সবদিক দেখে। সাধারণভাবে। নির্বিশেষভাবে।
প্রথানুযায়ী। আনুষ্ঠানিক। পোশাকি। বাহ্যিক। ঘটাপটা করে লোক দেখানো।
সাদাসিধে। আটপৌরে। আপনা-আপনির মধ্যে।
বিধিসম্মতভাবে। নির্দিষ্ট ফরম অনুযায়ী।
ব্যবস্থা নির্দেশ করা।
এই প্রসঙ্গে। এই পরিপ্রেক্ষিতে। এটা মাথায় রেখে। এটা হিসেব করে।
এটা বুঝে নিয়ে।
ওঁর উপস্থিতিতে। ওঁর সামনে। উনি এর সাক্ষী।
যে রকম অবস্থা, তাতে। অবস্থা দৃষ্টে। এ অবস্থায়।
নির্দেশ পালন করার সূত্রে।
ফলে। ফলত। ফলস্বরূপ। ফলপরিণামে।

বাংলার ধাতু

রবীন্দ্রনাথ এক সময়ে বাংলা ক্রিয়ার একটি তালিকা করেছিলেন। তার মধ্যে অনেক ক্রিয়াই এখনকার লেখায় তেমন ব্যবহার হতে দেখা যায় না। এর মধ্যে কিছু আছে নাম ধাতু। মন করলে জায়গা বিশেষে আমরা তা কাজে লাগাতে পারি।

যেমন: আঙলানো (আঙুল দিয়ে নাড়া)। আম্‌লানো (টকে যাওয়া)। উট্‌কনো (খোঁজা, ঘাঁটা)। উলোনো (নামিয়ে দেওয়া)। উজ্‌রানো (নিঃশেষ করা)।

ধান এলে দেওয়া (আল্‌গা করে ছড়িয়ে দেওয়া)।

কবলানো (কথা দেওয়া, স্বীকার করা)।

খাপানো (কাজে লাগানো)।

গগানো (মুমূর্ষু অবস্থায়)। গতানো (চালানো, গছানো)। গাবানো (পাঁকে জলে মাখামাখি করা। অনর্থক আলোচনা করা। বাকফাট্টাই)।

চানকানো (প্রতিমা বা পুতুলের চোখ আঁকা)।

চোপানো (অস্ত্র দিয়ে কোপানো)।

টোয়ানো, টুইয়ে দেওয়া (ওস্‌কানো)। ঢলকানো (কোনও তরল পদার্থ ঢালা কিংবা বিশেষ দিকে চালিত করা)।

থোয়া (রাখা)। থোড়া (কুচানো)।

নিছানো (নিংড়ানো, ছাঁকা, বাছা, ভুলে যাওয়া)।

নেটানো (টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া, কাছে নিয়ে যাওয়া)।

বিওনো (প্রসব করা)।

হেদানো (খেদ প্রকাশ করা)।

আশুতোষ দেবের বাংলা অভিধানে এইরকম আরও কিছু বাংলা ধাতুর খোঁজ মেলে—

কপচানো (শেখা কথা বলা)। কাঁড়ান (ছাঁটান, ভানান)। খাপা (খাপ খাওয়া, কমা)। গাবা (গর্ব করা, কলঙ্কিত হওয়া)। গুজরান (যাপন)। চাঁজকা (তৎপর করা)। চুনা (চয়ন করা)। ছাঁদা (ফাঁদা, পত্তন করা, বাঁধা)। ছিপা (গোপন করা)। জপান (ভজান)। টস্‌কান (নষ্ট হওয়া, ভাঙা)। ডাবা (বসে যাওয়া)। থুবড়া (নিচু মুখ হয়ে পড়া)। ধামসান (হাতে বা পায়ে চটকানো)। ধেড়ান (কাজে অপটুতা দেখানো)। বাগান (হস্তগত করা)। শানা (তৃপ্তি হওয়া)। সিজান (সিদ্ধ করা)। হাজা (জলে ভিজে নষ্ট হওয়া)।

বিজ্ঞাপনে 'দিল্ চাহে more'— দেখে খুব একটা যে অবাক হই, তা নয়। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায়: 'টেক্ টেক্, নো টেক্ নো টেক্, একবার তো সি'। ছেলেবেলায় মার্বেল খেলতে খেলতেই তো শুরু হয়েছিল সেই অমোঘ বাক্য— নট্ নড়নচড়ন, নট্ কিচ্ছু। কিংবা 'স্ট্যাচু'।

স্কুলে যাই। ক্লাসে উঠি। ফেল্ করি। পাশ করি। এতে বাংলাভাষার কোনও হানি হয় না।

কেউ কেউ প্রশ্ন করে: আপনার কি মনে হয় না বাংলাভাষার দিন ঘনিয়ে এসেছে?

শুনে বলতেই হয়— বালাই ষাট!

তার কারণ শুধু বাংলাভাষার ওপর টান আছে বলেই নয়। এখনও চোখের মাথা খাইনি বলেই সেইসব মানুষদের দেখতে পাই, রাজ্য জুড়ে যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলছে। বাঁচার জন্যে তাদের বাংলা ছাড়া গতি নেই।

ভাষা তাদের মা-টি। আর এই মাটির সঙ্গে তারা নাড়ির টানে বাঁধা।

পরকে তারা সহজেই আপন করতে পারে। কিন্তু দূরকে নিকট করার রাস্তা এখনও তাদের কাছে খোলা নেই।

তাছাড়া, বাংলাভাষার বয়সও তো এমন কিছু বেশি নয়। মাত্র হাজারখানেক বছর। সবে কলির সন্ধ্যে। এখনই হাল ছাড়ার কী হল?

বটতলার ঝামেলা

আদালতে বাংলা এ রাজ্যে কতটা কী চলছে আমার জানা নেই। সম্প্রতি 'দেশ' পত্রিকায় বিবেক দেবরায়ের 'আইন ব্যবস্থার পরিমার্জন' পড়ে যে কারও চোখ কপালে উঠবে। দেখা যাচ্ছে, এদেশে আইনের কোনও মা-বাপ নেই। ইংরেজের আমল থেকে কেন্দ্রে আর রাজ্যে আজ পর্যন্ত যা কিছু বিধিবদ্ধ হয়েছে পুরোপুরি কেউ তার নাগাল পাবে না। স্তূপীকৃত এইসব বিধিবিধানের কোনও ঝাড়াই-বাছাই হয়নি। এ এক বিচিত্র অবস্থা। আইনগুলো থেকেও নেই। কেননা কোনও বইতে ছাপা হয়নি। সুতরাং সাধারণ মানুষের জানার কথা নয়। আবার অজ্ঞতাবশত আইনভঙ্গ করাটাও কিন্তু শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এ যেন শাঁখের করাত।

অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, তাতে স্যাক্রার ঠুকঠাক দিয়ে চলবে না। দরকার কামারের এক ঘা।

আইনের রাজ্যে ঝাঁটা হাতে সাফাইয়ের কাজ চলুক, আমরা বরং সেই ফাঁকে ছাই উড়িয়ে, সাবেককালের কিছু হারানো রতন কুড়িয়ে নিই।

আইন্দা (আগামী)। অলি (অভিভাবক)। আওলাদ (ছেলেপুলে)। ওজরদার (আপত্তিকারী)। কমবক্ত (হতভাগ্য)। কলমবন্দ (লিপিবদ্ধ)। কারপরদাজ (এজেন্ট)। কিতা (দফা)। খাইখালাসি (উপস্বত্ব ভোগ)। খাতিরজমা (নিশ্চয়তা)। খোদকস্তা (যে গাঁয়ে বাস, সেখানেই চাষ)। খোদহাকিমি (ক্ষমতাহীনের ক্ষমতা জাহির)। খোদখত (ভালো হাতের লেখা)। গস্তিদার (যে ক্রয়যোগ্য মাল খুঁজে বেড়ায়)। গোস্তাকি (আদালত অবমাননা)। চকবন্দী (প্লটে ভাগ করা জমি)। জালসাজি (জালিয়াতি)। তরতফাত (ইতর বিশেষ)। দর পেশ (উত্থাপন)। দস্তবদস্ত (হাতে হাতে)। নিগাবানি (তদারক, তত্ত্বাবধান)। পেটাও (নির্ভরশীল)। ফেরফার (তারতম্য)। বাঁশগাড়ি (আদালতের হুকুমমতো দখল নেওয়া)। বিতং (বিশদ বিবরণ)। বেকবুল (অস্বীকৃত)। বেলমোক্তা (সর্বসমেত)। বেশর (নিঃসন্দেহে)। বেহুদ্দা (নির্বোধ)। ভাওলী (যে জমির খাজনা ফসলে দিতে হয়)।

মানানো আর বানানো

মুখে অনেক কিছুই বলা যায়। কিন্তু লিখতে গেলেই এসে যায় বানান আর ব্যাকরণের ঝামেলা। বাংলা বানানে নানা মুনির নানা মত। তেমনই বাংলা ব্যাকরণ এখনও মোটের ওপর সংস্কৃতের হাতধরা।

সংস্কৃতের আঁতুড়ঘরে জন্মালেও বাংলা এক আলাদা ভাষা। তার আছে নিজস্ব সব নিয়মকানুন। নিজস্ব চালচলন।

শুচিবায়ুগ্রস্তদের সঙ্গে আক্কেলমন্তদের এ নিয়ে অতীতে লড়াই কম হয়নি। বাংলাভাষায় সংস্কৃতের কিছু বাধ্যবাধকতা তো থাকবেই। কিন্তু তার ক্ষেত্র আর সীমা নিয়ে যে মতভেদ, আজও পুরোপুরি তার নিরসন হয়নি।

সংস্কৃত শেখাটা এখন আর স্কুলে বাধ্যতামূলক নয়। ফলে, যেসব সংস্কৃত শব্দ বাংলায় আমরা ব্যবহার করি, তার গঠন সম্বন্ধে স্পষ্ট কোনও ধারণা গড়ে ওঠে না। শব্দ গড়তে গিয়েও হিমসিম খেতে হয়।

মানা না মানার কিছু দ্বন্দ্ব কিন্তু থেকেই যায়।

সংস্কৃতের 'স্' বাদ দিয়েই আমরা লিখি মন, তপ, নভ, নম, পুর, শির। কিন্তু মনস্তুষ্টি, মনস্কাম, মনস্বী, তপোবন, তপস্বী, নভোমণ্ডল, নমস্য, নমস্কার, পুরোভাগ, পুরস্কার, শিরোপা— এসব না লিখে উপায় আছে? আবার

'মনঃসমীক্ষা' লিখলেও স্বচ্ছন্দে লিখি 'মনপবন'।
লিখি 'জগৎময়'। 'জগন্ময়' নয়।
সন্ধি সমাসে এমন দ্বিচারিতা খুঁজলে অনেক পাওয়া যাবে।
বাংলায় বিশেষণে আগে লিঙ্গভেদ করা হত। 'মহতী সভা', 'ফলবতী আশা', 'খরস্রোতা নদী'— এখন আর তা দরকার হয় না।
সন্ধির চেয়ে সন্ধি বিচ্ছেদেই এখন আমাদের টান বেশি। চলৎশক্তিকে চলচ্ছক্তি করলে যদি বা সহ্য হয়, তাই বলে 'বিদ্যুচ্ছক্তি' নৈব নৈব চ। অবশ্য বৈদ্যুতিক শক্ লাগাকে কেউ কেউ 'তড়িদাহত' লেখেন। 'দা'-এর এই কোপ কি না হলেই নয়?
বড় বড় সমাস আমাদের ধাতে সয় না। 'কৃতাঞ্জলিপুটে' বা 'নবজলধরপটল' কী দরকার? বরং বলব 'জোড়হস্তে' বা বড়জোর 'নবমেঘমালা'।

নজরে আনা, নজির টানা

প্রায়ই তুলনা টেনে বা উপমা দিয়ে আমরা কথা বলি। তার বেশিরভাগই হয় বহুপ্রচলিত। যেমন:
তুলোর মতো নরম। দুধের মতো সাদা। তালগাছের মতো লম্বা। আবলুশ কাঠের মতো গায়ের রং।
ঠান্ডা যেন বরফ। গরম যেন আগুন। যেন হিংস্র বাঘ।
ফুলের মতো সুন্দর। কাগজের মতো সাদা।
পাথরের মতো শক্ত। জলের মতো পাতলা। পালকের মতো হালকা। গুড়ের মতো মিষ্টি।
পাহাড়ের মতো অবিচল। বাঁশির মতো নাক।
গায়ে যেন সিংহের শক্তি। শেয়ালের মতো চতুর। যেন বোকা গাধা। শুকনো যেন কাঠ।
লোহার মতো কঠিন। রাজার মতো সুখী। বেতের মতো নমনীয়। যেন মুক্ত বিহঙ্গ। যেন অকূল পাথার। দ্বীপের মতো নিঃসঙ্গ। দেওয়ালের মতো নির্বাক। নিশ্চল যেন পাথরের মূর্তি। কাচের মতো ভঙ্গুর।
বিদ্যুৎগতি। চিলচিৎকার। জিলিপির প্যাঁচ। যেন ভেজা বেড়াল।
ঘাসের মতো সবুজ। রক্তের মতো লাল। যেন শরতের নীল আকাশ। হরিণের মতো চোখ। যেন কেউটে সাপ।

যেন জলছাড়া মাছ। যেন ধোপার গাধা।
কাটা পাঁঠার মতো। দুঃস্বপ্নের মতো সেই অতীত। যেন সাক্ষাৎ নরক।
বাজপাখির মতো দৃষ্টি। রাক্ষসের মতো খিদে।
যেন হালভাঙা নৌকো। যেন ঝড়ের মুখে কুটো। যেন ফাঁকা মাঠে গোল করা।

কিছু নুন ঝাল

ফাইলপত্রে এবার ফিরে আসা যাক। পরিভাষা নয়। সাদামাঠা বাংলায় অনেক কিছুই লেখা যায়। যেমন:
প্রসঙ্গত। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে। আরও কথা এই যে।
অনুচিত। অসঙ্গত হস্তক্ষেপ। প্রভাব খাটানো। অনর্থক নাক গলানো।
পরস্পর। নিজেদের মধ্যে।
এখানে নীতির প্রশ্ন জড়িত।
এ থেকে ধরে নেওয়া হবে। এর ব্যাখ্যা হবে এই যে।
মুলতুবি রাখা হোক। আপাতত স্থগিত থাক।
যথা নির্ধারিত/যথাবিহিতভাবে।
বিচারাধীন বিষয়। বিবেচ্য বিষয়।
সেইমতো জানিয়ে দেবেন।
সর্বতোভাবে। যে-কোনও প্রকারে। যে-কোনও মতে।
কিছুতেই না। কোনওক্রমেই নয়।
যা আবশ্যক হয় করবেন। যা করলে হয় করবেন।
মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। এ বিষয়ে কিছু বলার নেই।
এটা নজরে এনে অফিস থেকে যেন ব্যবস্থা নেওয়া হয়।
বৈধতা/বিশেষাধিকারের প্রশ্নে।
এই হেতু। এইসব কারণ বিধায়। এই সমুদয় কারণের জন্যে।
এর বিপরীতে। অন্য দিক থেকে।
আদেশ জারি করা হোক। আদেশ প্রার্থনা করি।
পাওনা মেটানো হোক। অর্থ মঞ্জুর করুন।
ফাইলটি তাড়াতাড়ি ফেরত চাই। ফাইলটি ফেলে রাখবেন না।
এর গোপনীয়তা যেন সুরক্ষিত হয়। এ বিষয়ে যেন আর কেউ না জানে।
মনে করিয়ে চিঠি দেবেন। স্মারকপত্র দেবেন।

এক্ষেত্রে তার প্রাসঙ্গিকতা নেই। সে কথা এখানে খাটে না। এখানে সে প্রশ্ন অবান্তর।

চোখে মুখে

দফতর ছেড়ে গায়ে এবার একটু হাওয়া লাগানো যাক।

বাংলাভাষা শুনতে মিষ্টি। বাইরের লোকেরাই তা বলে থাকে। এর পিছনে শুধু এখানকার জল মাটি হাওয়া নয়, সাবেককালের অনার্যভাষী আদিবাসীদের হাত আছে। অনুকার শব্দ, জোড়া কথা, সুর করে বলা— সব মিলিয়ে হয়তো এইজন্যেই রবীন্দ্রনাথ বাংলাকে বলেছিলেন 'ভঙ্গীওয়ালা ভাষা'। এমন ঠারে-ঠোরে বলবার ক্ষমতা খুব কম ভাষারই আছে।

না, নাকো, নাকি, বা, বুঝি, যে, বলে, তো, গে, ই, বৈকি, চাই— এইসব জুড়ে নানা রকমের ভাব ফুটিয়ে তোলা যায়। যেমন:

আমার হয়ে ওঁকে একটু বলুন না।

না জানি কত কষ্টের মধ্যে সে আছে।

এই বৃষ্টিতে না বেরনোই ভালো।

না, আজ আমাকে অফিস যেতেই হবে।

হুঁ, আমি আবার জানি না।

না যান, না যাবেন।

না হয় নাই বললেন।

শুধু ভাত— না ডাল, না তরকারি।

ছোটদের কথায় রাগ করতে নেই।

হলই বা আপনার লোক, দোষ করে থাকলে শাস্তি পাবে।

ওর কথা বল না'কো।

আমার ভয় এই বুঝি ও কেঁদে ফেলে।

যাবে তো এইবেলা চলো।

যাক গে, ওকে ওসব জানিয়ে কাজ নেই।

ওঃ, কী খেলাটাই না খেলল।

নেমন্তন্ন করেছে যখন, যাবে বৈকি।

তেমন হলে, চাই কি, আমি থেকেও যেতে পারি।

যে রাঁধে, সে চুলও বাঁধে। কাজের মধ্যেও একটু বাহার।

কথায় চাই একটু রং। নইলে লোকের মনে ধরবে কেন?

চাই প্রবাদ প্রবচন। চাই কিছু ধরতাই বুলি।
এক সময়ে ঠাকুমা-দিদিমারাই দিতেন এসব জোগান। পরিবার ছোট হয়ে গিয়ে এখন তাতে টান পড়েছে।
দেখতে হবে এই লক্ষ্মীর ভাঁড়ার যেন আমরা খুইয়ে না বসি।
যেমন। অম্বল চেখে বেড়ানো। কেউ যদি লেগে থেকে একটা কাজ না করে, তাকে বলা যায়: 'আজ এটা কাল সেটা না করে যেটা করছ মন দিয়ে করো; কেবল অম্বল চেখে বেড়ালে আখেরে মারা পড়বে।'
আজ নয় কাল (করছি করব ভাব)। আজ না হয় কাল (অবশ্যম্ভাবী)। আজ বাদে কাল (বেশি দেরি নেই)।
আড়ে হাতে লাগা (উঠে পড়ে লাগা)।
আত্ম রেখে ধর্ম (আপনি বাঁচলে বাপের নাম)।
আমড়া কাঠের ঢেঁকি (অসার, অকর্মণ্য)।
আমড়াগাছি (ধানাই পানাই, চাটুকারিতা)।
উজানের কৈ (যা বিনা আয়াসে মেলে)।
এক কাঠি সরেশ (ওপর দিয়ে যায়)।
এক ক্ষুরে মাথা কামানো (এ বলে আমায় দ্যাখ, ও বলে আমায় দ্যাখ)।
এক পা গঙ্গাজলে (যার মরার বয়স হয়েছে)। ওর একাদশ বৃহস্পতি (পরম ভাগ্যবান)।
এগারো ইঞ্চি (আস্ত ইট)।
কড়ি-কপালে (ভাগ্যগুণে যার অনেক পয়সা)। কড়িকাঠ গোনা (কিছু না করে কালক্ষয়)।
কথার ভট্‌চায্যি (কচি মুখে পাকা পাকা কথা)।
কবুল জবাব (ঠিক বলে মানা)।
কল টেপা (পিছনে থেকে চালনা করা)। কলা বউ (একগলা ঘোমটা টানা লজ্জাশীলা)।
কাজীর বিচার (বিচারের প্রহসন)।
কালাপানি, পুলিপোলাও (দ্বীপান্তর দণ্ড)।
কুটো নেড়ে দুখানা নাকরা (সামান্য কাজও না করা)।
কৃষ্ণের জীব (দেখে মায়া হয় এমন কোনও অক্ষম প্রাণী)।
কে-ও-কেটা (কেউকেটা) নয় (গণ্যমান্য, কেষ্টবিষ্টু)।
কেঁচে গণ্ডুষ করা (আবার গোড়া থেকে শুরু করা)।

কোথায় লাগে (সমকক্ষ নয়)।
খইয়ে বন্ধন (খুঁটি জড়ানো দু-হাতের আঁজলায় খই নিলে সে-খই মুখে তোলাও যায় না, খইসুদ্ধ হাত ছাড়ানোও যায় না)।

হর কিসিম

বিশেষ্য মানেই হল যাবতীয় নাম। নামের বদলে যা বসে তাই সর্বনাম। দুটোকে একত্র করে বলা হয় নামপদ।
বিশেষণের কাজ সবিশেষ চেনানো। দোষগুণ সংখ্যা পরিমাণের খবর দেওয়া।
বিশেষ্য আর বিশেষণের মধ্যে ধরাবাঁধা কোনও দেওয়াল নেই। বিশেষণ যেমন বিশেষ্য হতে পারে। তেমনই বিশেষণও বিশেষ্যের জায়গা নিতে পারে। যেমন: এখানে অনেকরকম মিষ্টি পাওয়া যায়। চারদিকে আর্তের কান্না।
আবার বিশেষ্যও বিশেষণ হয়। যেমন: বনফুল, ডুবসাঁতার, তোলা-উনুন, কাঁটাগাছ।
বাংলা তারিখে বিশেষণধর্মী ক্রমবাচক শব্দ: পয়লা, দোসরা, চৌঠা, পাঁচই, উনিশে।
গণনা আর পরিমাণে: দুনো, তিনগুণ, সিকি, চৌকো, পোয়া, পৌনে, সওয়া, পাঁচ সিকে, দেড়, দেড়া, সাড়ে, আড়াই।
আস্তে হাঁটো, জোরে দৌড়োও— এইসব ক্রিয়া-বিশেষণ ছাড়াও আছে বিশেষণের বিশেষণ। খুব আস্তে হাঁটো, আরও জোরে দৌড়োও।
বাংলায় বিশেষণ বানাবার কিছু নিজস্ব ধরন আছে। যেমন: হুজুগে, হিংসুটে, মেয়েলি, আদুরে, দাবাড়ু, ফাঁকিবাজ, নেশাখোর, ঝড়ো, কুঁদুলে, লাঠিয়াল, সাঁতারু, বলিয়ে-কইয়ে, লড়াকু। উড়ন্ত, চলন্ত, নিভন্ত, পড়ন্ত। কালচে, গোলালো, সাদাটে, কাঁদুনে, লাগানে, ফাঁপানো, পাতানো, উঠতি, চলতি।

কিছু বোলচাল

এবার ফেরা যাক বোলচালের কথায়।
খড়ি পাতা। খড়ি দিয়ে গণৎকারের আঁকাজোকা।
খড়ের আগুন। দপ্ করে জ্বলে ফস্ করে নিভে যাওয়া। চট করে রাগা,

আবার তখনই রাগ পড়ে যাওয়া।
নবাব খাঞ্জা খাঁ। প্রচণ্ড বিলাসী।
খয়ের খাঁ। পা-চাটা। পোঁ-ধরা।
খিচুড়ি পাকানো। জটিল করে তোলা।
খুন চাপা। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হওয়া।
গণেশ ওলটানো। ব্যবসায় লালবাতি জ্বলা।
গয়ংগচ্ছ করা। গড়িমসি করা।
গলায় গামছা দেওয়া। জোর জবরদস্তি করা।
গায়ে পড়া। উপযাচক হওয়া।
গায়ে না মাখা। অগ্রাহ্য করা।
কোনও গুণে ঘাট নেই। সর্বদোষের আকর।
গোঁফ-খেজুরে। অসম্ভব কুড়ে।
গোড়ে গোড় দেওয়া। নির্বিচারে সমর্থন করা।
গোদের ওপর বিষফোড়া। উপর্যুপরি বিপদ।
ঘরবার করা। প্রতীক্ষায় ছটফট করা।
ঘাট হওয়া। দোষ স্বীকার। ঘাট মানা। হার মানা।
ঘাস কাটা। বৃথা শ্রম।
ঘাসে মুখ দিয়ে চলা। যার বুদ্ধিশুদ্ধি নেই।
ঘোড়া দেখলেই খোঁড়া হওয়া। সুবিধে পেলেই কাজে লাগানো।
ঘোড়ায় জিন দিয়ে আসা। ত্বর না সওয়া।
ঘোল খাওয়ানো। মুশকিলে ফেলা।
ঘোড়ার ডিম— অবাস্তব। কচু। ছাই।

দফতরি

এবার ফাইলের লাল ফিতে খোলা যাক!
এ সম্পর্কিত কাগজপত্র পেশ করুন।
এক্ষেত্রে এটি অপ্রাসঙ্গিক।
এর পূর্ববর্তীকালেও প্রযোজ্য হবে।
স্থিতাবস্থা বজায় থাকবে। যেমন আছে থাকবে।
অনুমোদনসাপেক্ষ।
পড়ে দেখার জন্যে। অনুধাবনের জন্যে।

সেইমতো ব্যবস্থা নিন।
প্রস্তাবটি যথাযথ। গ্রহণযোগ্য প্রস্তাব।
প্রত্যয়িত করা। সাবুদ করা।
পদ্ধতি অনুযায়ী। ঠিক তরিকায়। প্রণালী মেনে।

অক্ষর জোড়া

আগের শব্দের শেষ আর পরের শব্দের আদি বর্ণ জুড়ে গেলে, হয় সন্ধি। সাধারণত সংস্কৃতের সন্ধিযুক্ত পদ আমরা বাংলায় অবিকল ব্যবহার করে থাকি। যেমন: গোলার্ধ, একাধিপত্য; অভীষ্ট, অতীন্দ্রিয়; অনূর্ধ্ব, কটূক্তি; অন্ত্যেষ্টি, যথেষ্ট; সর্বোচ্চ, গ্রামোন্নয়ন; জনৈক, মতৈক্য; জলৌকা, মহৌষধ; গত্যন্তর, প্রত্যেক; মন্বন্তর, অন্বেষণ; স্বচ্ছন্দ, পরিচ্ছেদ; দিগন্ত, বাগাড়ম্বর; সচ্চরিত্র, উচ্ছেদ; সজ্জন, বিপজ্জনক; উদ্দেশ, উদ্ধৃত; উচ্ছৃঙ্খল, উচ্ছ্বাস; উন্মার্গ, উদ্ধত; দিগ্‌গজ, ষড়্‌দর্শন; দিঙ্‌নাগ, বাঙ্ময়; শিরশ্ছেদ, নভশ্চর; ইতস্তত, ধনুষ্টঙ্কার; আবিষ্কার, পুরস্কার; শিরঃপীড়া, অধঃপাত।
কিছু আছে আধা সংস্কৃত সন্ধিযুক্ত পদ। যেমন: হিসাবাদি, খ্রিস্টাব্দ, আইনানুযায়ী, ইংলন্ডেশ্বরী।
অনেক সময় বিসর্গ বাদ দিয়েও বাংলায় সন্ধি করা হয়। যেমন: মনান্তর, যশাকাঙ্ক্ষা, জ্যোতীশ, তেজেন্দ্র।
কখনওবা সন্ধি না করেও শব্দ জোড়া হয়। যেমন: স্বইচ্ছায়, শরৎচন্দ্র, স্ত্রীআচার, প্রীতিউপহার। পিতৃআত্মা, দৃষ্টিআকর্ষণী, পুত্রঅন্তপ্রাণ।
কিছু সন্ধি সাধারণত মুখের কথায় থাকে:
হাদ্ধরা (হাতধরা), ছোড়দা (ছোটদা), বট্‌ঠাকুর (বড়ঠাকুর), পাঁশ্যের (পাঁচ সের), পাঁশ্য (পাঁচশো), পাঁজ্জন (পাঁচজন), তাত্থেকে (তার থেকে), কদ্দিন (কত দিন), যদ্দিন (যত দিন)।
আজকাল লেখাতেও দেখা যায়: কোত্থেকে, কোত্থাও, বচ্ছর, বজ্জাত, যাচ্ছেতাই, কুচ্ছিত, দুত্তোর, ভাল্লাগে না, বিচ্ছিরি, মচ্ছব, অব্দি, পিট্টান, জোচ্চোর, কত্তাল, ঢেঁস্‌কেল, উচ্ছন্ন, মাট্‌কোঠা।

রকমারি

লোকমুখের বাঁধাবুলিতে আবার একটু চোখ বোলানো যাক।
চক্ষুদান (আত্মসাৎ। চুরি।)।
চাল চিঁড়ে বেঁধে যাওয়া (অনেকটা পথ)।
চিচিং ফাঁক (ফুসমন্তরে বন্ধ দরজা খোলা)।
চুল-চেরা (অতি সূক্ষ্ম)।
চোখ কপালে তোলা (অবাক হওয়া)। চোখকান বুঁজে থাকা (জেনেও কিছু না বলা)। চোখ টাটানো (হিংসে হওয়া)। চোখ টেপা (চোখের ইশারা)। মনকে চোখ ঠারা (নিজেকে স্তোক দেওয়া)। চোখ দেওয়া (নজর দেওয়া)। চোখ পাকানো (শাসানো)। চোখ ফোটা (ভালোমন্দ বোঝা)। চোখ বোঁজা (মারা যাওয়া)। চোখ বুলানো (ওপর-ওপর দেখে নেওয়া)। চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো (স্পষ্ট করে দেখানো)। চোখে চোখে রাখা (নজর রাখা)। চোখে ধুলো দেওয়া (প্রতারণা)। চোখের চামড়া না থাকা (নির্লজ্জতা)। চোখের দুপাতা এক করা (ঘুমানো)। চোখের বালি (চক্ষুশূল)। চোখে ধরা (দেখে পছন্দ হওয়া)।
চোদ্দ পোয়া হওয়া (সাড়ে তিন হাত হওয়া। শোয়া)।
চোরের ওপর বাটপাড়ি (চোরের জিনিস হাতিয়ে নেওয়া)। চোরের মা-র বড় গলা (নির্লজ্জের সাফাই)। চোরের ওপর রাগ করে মাটিতে ভাত খাওয়া (পরের ওপর অভিমান করে নিজেকে কষ্ট দেওয়া)।
ছাইচাপা আগুন (বাইরে থেকে ধরা যায় না)।
ছিনে জোঁক (নাছোড়বান্দা)।
ছেঁদো কথা (বানানো কথা)।
ছেড়ে কথা না বলা (রেয়াত না করা)। ছেড়ে দিয়ে তেড়ে ধরা (আল্‌গা দিয়ে ফের চেপে ধরা)।
ছোট মুখে বড় কথা (অহঙ্কার দেখিয়ে মান্য ব্যক্তিকে খাটো করা)।

শব্দ জোড়া

সংস্কৃতে সন্ধি আর সমাস দিয়ে বাক্য ঠাসা থাকে। সংস্কৃত সমাসবদ্ধ অনেক শব্দই বাংলায় আমরা ব্যবহার করি।
যেমন: অহোরাত্র, আদ্যন্ত, শীতোষ্ণ, তিথিনক্ষত্র। (দ্বন্দ্ব সমাস)। যাদের

জোড়া হয়েছে, তারা প্রত্যেকেই স্বপ্রধান। সমানে সমান। এই ধরনের সমাস বাংলাতেও আমরা গড়ে নিয়েছি। যেমন: ইটকাঠ, ডালভাত, সাতপাঁচ, হয়-নয়, খুনজখম, টাকাপয়সা, হাতপা, বেশকম, ভাইবোন, গাড়িঘোড়া, তেল-নুন-লক্‌ড়ি, সাহেব-বিবি-গোলাম, নাচ-গান-বাজনা।
সমার্থক: দলিলপত্র, বিলিবণ্টন, ঠাট্টাতামাসা, দালানকোঠা।
আছে বিভক্তিযুক্ত পদ: মাঠেঘাটে, আগেভাগে, ঠারেঠোরে, বুকেপিঠে, আগেপরে, বনেজঙ্গলে, ধনেধান্যে, তেলেবেগুনে, ঝালে-ঝোলে-অম্বলে।
পরের পদের জোর বেশি হয় তৎপুরুষ সমাসে। পোকা-খাওয়া, বাঘ-ডাকা, ধুলো-লাগা, ভাঁটা-পড়া, গাড়ি-চলা, ভূতে-পাওয়া।
ধান-কাটা, মাথা-গোঁজা, জান-কবুল, কাপড়-কাচা, জল-তোলা, রথ-দেখা, মুখনাড়া, ঘর-ধোয়া, দা-কাটা, ঢেঁকি-ছাঁটা, ছাতা-পেটা, দুধভাত, বাণমারা, মধুমাখা। আগাগোড়া, দেশছাড়া, ঘর-পালানো।
দলছুট। ধানখেত, রেলভাড়া, ডাকমাশুল, লিচুবাগান, ডালবড়া, খালপার, চটকল।
রাতকানা, গাছপাকা, ঘরপোড়া, বস্তাপচা, ধামাধরা, কর্তাভজা, ধনুক-ভাঙা।
অপারগ, আকাঁড়া, না-বলা, বেকসুর, গরহাজির, নিমরাজি, আধপাকা।
এছাড়া: হরদম, রাতারাতি, মাথাপিছু, গরমিল।
আছে: দিশেহারা, গাঁটকাটা, সবজান্তা, বাঁধিয়ে-রাখা।
বাস্তুহারা, হাত-ধরা। জাতে-ঠেলা, গায়ে-পড়া, মামারবাড়ি, গরুরগাড়ি, গায়েহলুদ, ছিপে-গাঁথা, হাতে-গরম, বানে-ভাসা, দাঁড়ে-বসা, দলে-থাকা, গলার-কাঁটা, দিনে-ডাকাতি।
নিত্য-সমাসে ভেঙে বলার দরকার হয় না।
যেমন: কাঁচা কলা, সাদা পোশাক, ভালো মানুষ, আতান্তর।

খোলা বাজার

সকালবেলায় যে-কোনও বাংলা কাগজ ওল্টালেই বোঝা যায়, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞাপনের আকাল চলেছে। বেশিরভাগই আদ্যন্ত ইংরিজিতে লেখা। কোনওটাতে বাংলা শব্দের ছিটেফোঁটা।
একটির মাথায় 'জাগায় বিশ্বাস' আর 'বাড়ায় আত্মবিশ্বাস' আর পেটের কাছে 'ইয়ে অন্দর কী বাত হ্যায়।'

ক্ষিধের পেটে গিলতেই হয়। ভিক্ষের চাল কাঁড়া আর আকাঁড়া।
সাইকেলের এক বিজ্ঞাপনের শিরোদেশে লেখা: 'ভরসামন্দ লাভবান'।
এমন সাইকেল শেষ পর্যন্ত চললে হয়!
এই খরার বাজারেও প্রাণে জল ঢেলেছে আনন্দবাজার গ্রুপের কিছু অসামান্য বাংলা স্লোগান।
কিন্তু পড়তে না পড়তেই চেটেপুটে শেষ। হাত তুলে বসে থাকতে হচ্ছে। খোলা বাজারে নাকি পাঞ্জা লড়তে হবে। জিনিসের সঙ্গে চলবে জিনিসের টক্কর। খদ্দের ধরতে হবে। কার কী গুণ, কার দৌড় কত— তার পরখ হবে। তাহলে তো বিজ্ঞাপনে ঢল আসা উচিত। মন জানতে হবে গ্রাহকের। আপন ভাষায় তার মন জোগাতে হবে।
সিগারেটের কপাল পুড়েছে। তেমনই কপাল খুলেছে গায়ে-মাখা আর কাপড়-কাচা সাবানের। পকেট ভারী হওয়ায় মানুষের নোলা বাড়ছে। গায়ে পায়ে চাই আটপৌরে আর বাহারে জিনিস। চলতে ফিরতে আর ভার বইতে চাই দুই তিন চার চাকার গাড়ি।
সারা দুনিয়ার সঙ্গে চলবে দেওয়া-নেওয়া। কী যেন বলে। বিশ্বায়ন।
মাতৃভাষাকে করে তুলতে হবে স্বনির্ভর। অন্য যাবতীয় ভাষা নাগালে আনতে হবে।
কাজের জগতে যেন সবকিছুই এসে যায় বাংলার মুঠোয়।

নাটের গুরু

আমরা যে যাই বলি, আদত কথা হল ক্রিয়া। যাকে বলে, নাটের গুরু। বাংলা বাক্যে এই নাটের গুরুটি অনেক সময় সামনে না এসে নেপথ্যে থাকে। যেমন: আমার হাতে (আছে) একটা কলম। মেয়েজামাই (থাকে) আমেদাবাদে; ছেলে (থাকে) নিউ জার্সিতে; কলকাতায় একা (থাকেন) বিধবা মা। ট্রেনে আগের কামরায় উঠেছে মোহনবাগান, পরের কামরায় (উঠেছে) ইস্টবেঙ্গল। ক্রিয়ায় থাকে সময়ের চিহ্ন।
করে। করছে। করে চলেছে (শেষ হয়নি)। করেছে (করা শেষ)। করো। করল। করত। করেছিল। করছিল। করে চলেছিল। করবে। ক'রো।
অবশ্য ক্রিয়ায় যে কালচিহ্নই থাক, প্রসঙ্গ থেকেই ঘটনাটি কবেকার তা বোঝা যায়।

চিঠিটা লেখেন মহকুমা হাকিম।
একটু অপেক্ষা করুন, আসছি।
এটা হয় আমি চাই।
টানা বাক্যে একই ক্রিয়া একবার দিয়ে পরে আর না দিলেও চলে। এই কলমটা দিয়েছেন বাবা, খাতাটা ছোটকাকা আর অ্যালার্ম-ঘড়িটা মা।
ক্রিয়াপদকে বিশেষণ হিসেবেও আমরা ব্যবহার করে থাকি।
করা কাজ। হওয়া চাকরি। খাওয়া ভাত। জানা কথা। চষা ভুঁই। ছাড়া গরু। মরা ইঁদুর। পাওয়া জিনিস। দেখা ছবি। শোনা গল্প।
বাংলায় ক্রিয়া দিয়েও বাক্য শুরু করা যায়। যেমন, 'ওর কাণ্ডটা দেখলে' না ব'লে বলা যায় 'দেখলে তো ওর কাণ্ডটা'। আবার জোরের তফাত হয় যদি বলা যায় 'কাণ্ডটা ওর'।
বাক্য দানা বাঁধে ক্রিয়াকে উপলক্ষ ক'রে। কে কী কাকে কেন কীভাবে কোথা-থেকে কোথায় কবে— ক্রিয়াকে এইসব জানিয়ে তবে বাক্যে ঠাঁই পেতে হয়। প্রত্যেকটি শব্দ আগে পরে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে জায়গামতো বসবে। কোনও বাক্য অযথা দীর্ঘ হলে অনেক সময় শব্দের মধ্যেকার দূর সম্পর্কের জন্যে অর্থের খেই হারিয়ে যায়। সেক্ষেত্রে ছোট ছোট বাক্য হলে ভুল বোঝা এড়ানো যায়। সেইসঙ্গে দেখতে হবে যুক্তি শৃঙ্খলায় যেন ব্যাঘাত না হয়।

ক্রিয়ার মূলে

ক্রিয়ার মূলে আছে ধাতু। হওয়া, খাওয়া, দেওয়া, শোয়া, করা, কওয়া, কাটা, গাওয়া, লেখা, ওঠা, লাফানো, ঘোরা, ফেরা, ধোয়া, দৌড়নো, চট্‌কানো, বিগ্‌ড়ানো, ওল্টানো, ছোবলানো— এসবের ধাতুমূল যথাক্রমে হ্, খা, দি, শু, কর্, কহা, কাট্, গাহ্, লিখ্, উঠ, লাফা, নাহা, ঘুরা, ফিরা, ধোয়া, দৌড়া, চট্‌কা, বিগ্‌ড়া, উল্‌টা, ছোব্‌লা।
ধাতুমূল জানা থাকলে অনেক সময় অচেনা শব্দের অর্থও আঁচ করা যায়। কেননা ধাতুর সঙ্গে প্রত্যয় যোগ ক'রে শব্দ গড়া হয়।
ঠিক শব্দ, ঠিক বানান, আর ঠিক মানে— এর যেকোনওটা জানার জন্যেই হাতের কাছে রাখা দরকার একটা জুতসই বাংলা অভিধান।
এইসব অভিধানে শব্দার্থ ছাড়াও আমাদের দৈনন্দিন কাজে লাগার আরও অনেক কিছু থাকে।

অভিধান

কয়েকটি অভিধান থেকে তার কিছু নমুনা দিই।

নূতন বাংলা অভিধান। আশুতোষ দেব। ১৯৩৭। শব্দাংশ ছাড়াও এতে আছে: চরিতাবলী, সাহিত্য পরিচয়, ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক সহ বিবিধ জ্ঞাতব্য, প্রবচন সংগ্রহ, বাংলা ধাতু, বিপরীতার্থক শব্দ, এককাবলী (মাপ, ওজন, মুদ্রা, দ্রব্য গণনা ইত্যাদি)। বাংলা বানানের নিয়ম, শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ, প্রুফ-সংশোধন পদ্ধতি।

সরল বাংলা অভিধান। সুবলচন্দ্র মিত্র। জুলাই ২০০০। শব্দার্থ ছাড়াও জীবনচরিত প্রভৃতি। সংস্কৃত ও বাঙ্গলা গ্রন্থাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ। আদালতে, মহাজনী ও জমিদারী সেরেস্তায় ব্যবহৃত শব্দাবলী। প্রবাদরূপে প্রচলিত সংস্কৃত শ্লোকাবলী। বাঙ্গলা প্রবাদ ও প্রবচন। অর্থভেদে শব্দবিভাগ। সচরাচর ব্যবহৃত অশুদ্ধ পদের তালিকা। হিন্দুসঙ্গীত। প্রুফ-সংশোধন প্রণালী।

চলন্তিকা। রাজশেখর বসু। ১৯৪৬। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত বাংলা বানানের নিয়ম। কতকগুলি সংস্কৃত শব্দের বানান। ণত্ব ষত্ববিধি। সন্ধি। ক্রিয়ারূপ। শব্দবিভক্তি ও কারক। সর্বনাম। সংখ্যাবাচক শব্দ। অশুদ্ধ পদ। পারিভাষিক শব্দ।

সংসদ বাঙ্গলা অভিধান। সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানের নিয়ম। পারিভাষিক শব্দ।

ভাষা চিরদিন এক থাকে না। অপ্রচলিত শব্দের জায়গা নেয় সমকালের চলিত শব্দ। বইয়ের কলেবর ছোট করতে গিয়ে নতুন অভিধানে দৈনন্দিন কাজে লাগার অনেক কিছুই খোয়া যায়।

অন্যদিকে, বড় বড় জনপ্রিয় পুরোনো অভিধানগুলোর দাগরাজির কোনও ব্যবস্থা হয় না। সরকার আর পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাদেমি এ কাজে তাঁদের সহায় হতে পারেন।

এমন একটি সর্বার্থসাধক অভিধানের পরিশিষ্টে যোগ করা যেতে পারে:

এ কালে পরিবার ছোট হয়ে যাওয়ায় আত্মীয়বাচক অনেক শব্দই ছোটদের অজানা থেকে যাচ্ছে। শব্দগুলো ধরিয়ে দেওয়া দরকার।

আত্মীয়স্বজন

বাবা, আব্বা। মা, আম্মা। ভাই, বোন, দাদা, দিদি, আপা। কাকা, খুড়ো,

জ্যাঠা, চাচা। কাকিমা, জ্যেঠিমা, চাচী। পিসিমা, ফুফু। পিসেমশাই, ফুফা। মামা, মামু, মামিমা। মাসিমা, খালী। মেসোমশাই, খালা। জেঠতুতো, খুড়তুতো, চাচাতো। পিসতুতো। ফুফাতো। মাস্‌তুতো, খালাতো। ভাইপো, ভাইস্তা, ভাতিজা। ভাইঝি, ভাতিজী, ভাস্তী। ভাগ্‌নে, ভাগনা। ভাগনি। বোনপো। বোনঝি।

শ্বশুর। শাশুড়ি। ভাশুর, জা। দেওর। ননদ, ননদাই। ভাশুরপো, ভাশুরঝি। ননদের জায়ের ছেলেমেয়ে।

ঠাকুরদা, দাদা। ঠাকুরমা, দাদি। দাদামশাই, দাদু, আজা। নানা। দিদিমা, দিদা, আজী, আইমা, নানী।

বৌদি, বৌঠান, ভাবী। ভাইবৌ, ভাজ। শালা। ভগ্নীপতি। জামাইবাবু, বোনাই।

ভাই-বোনের/শ্বশুর: তালই মশাই। শাশুড়ি: মাউই মা।

মাধুকরী

বানান, ব্যাকরণ, বিপরীতার্থক শব্দ, শব্দ সন্ধান, সুষ্ঠু প্রয়োগ— এসব নিয়ে ইদানীং ছোট ছোট কিছু অভিধান বেরিয়েছে, যা সবরকম লেখাতেই খুব কাজে লাগে।

কাজের বাংলায় মাধুকরী বৃত্তিই আমার নির্ভর।

একই শব্দ কখনও বিশেষ্য, কখনও বিশেষণ, কখনও সর্বনাম, কখনও ক্রিয়া-বিশেষণ, কখনওবা অব্যয় হিসেবে ব্যবহার করা হয়। যেমন:

অদৃষ্টের পরিহাস (বি.); অদৃষ্টপূর্ব (বিণ.)। অন্ধের মতো চলেছে (বি.); অন্ধ হতে চলেছে (বিণ.)। কর্তব্যের মধ্যে পড়ে (বি.); এটা করা কর্তব্য (বিণ.)। কী নাম ওর? (সর্বনাম); ওটা কি ঘেঁটুফুল? (অব্যয়); কী কাণ্ডটাই না করলে! (বিণ.)। কোন টিম খেলছে? (সর্বনাম); কোন রাজ্যে আছ? (বিণ.); কোনখানে যাই (ক্রি. বিণ.)। গুরুর কাছে শিষ্য (বি.); গুরু দণ্ড (বিণ.)। ঠিক করেছি যাব (ক্রি. বিণ); ওর কথার ঠিক নেই (বি.), তুমি ঠিক জবাব দিয়েছ (বিণ.)। জোরের কাজ নয় (বি.); জোর গুজব (বিণ.)। উনি গরিবের বন্ধু (বি.); গরিব হলেও ওঁকে যেন অবজ্ঞা কোরো না (বিণ.)। দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন (বি.)। দুষ্ট ব্রণ (বিণ.)। দ্রুত গতি (বিণ.); দ্রুত ছোটা (ক্রি. বিণ.)। পড়া বই (বিণ.); লেখা আর পড়া (বি.)। ওটা পিছন (বি.); পিছন টান (বিণ.); পিছনে চলো (ক্রি. বিণ.)। পুণ্যের ফল

(বি.); পুণ্য কাজ (বিণ.)। ভালোর জন্যে (বি.); ভালো লোক (বিণ.); ও ভালো লেখে (ক্রি. বিণ)। যে সয়, সে রয় (সর্বনাম); খুব যে হাসছ (অব্যয়); যে-খাওয়ান খাইয়েছে (বিণ.)। রক্ত বর্ণ (বিণ.); রক্তের সম্পর্ক (বি.)। শোনা কথা (বিণ.); কথা শোনা (বি.)। সত্যের সন্ধান (বি.); সত্য কথা (বিণ.)। সে তোমাকে চেনে (সর্বনাম); সে জিনিস আর নেই (বিণ.); সেই তো এলে, বাপু (অব্যয়)। সাধুর বেশ (বি.); সাধু ব্যক্তি (বিণ.)।

সংখ্যাবাচক

সংখ্যাবাচক শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক উচ্চারণ কোনও কোনও সময় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সেটা খেয়াল রেখে স্পষ্ট করে লেখা দরকার: পাঁচ, চোদ্দ, পঁচিশ, পঁয়ত্রিশ, ছত্রিশ, সাঁইত্রিশ, চুয়াল্লিশ, পঁয়তাল্লিশ, ছেচল্লিশ, পঞ্চান্ন, ছাপ্পান্ন, পঁয়ষট্টি, পঁচাত্তর, পঁচাশি, অষ্ট আশি, পঁচানব্বই, আটানব্বই, নিরানব্বই।

তারিখ: পয়লা, ১লা। দোসরা, ২রা। তেসরা, ৩রা। চৌঠা, ৪ঠা। পাঁচই থেকে আঠারোই (৫ই থেকে ১৮ই) সংখ্যার শেষে 'ই' দিয়ে। তারপর উনিশে (১৯ শে), বিশে থেকে মাসের শেষ তারিখ অবধি সংখ্যার শেষে থাকবে 'শে'।

সংস্কৃত	সংখ্যাপূরণবাচক	বাংলা
এক	প্রথম	১ম
দ্বি	দ্বিতীয়	২য়
ত্রি	তৃতীয়	৩য়
চতুঃ	চতুর্থ	৪র্থ
পঞ্চ	পঞ্চম	৫ম
ষট্	ষষ্ঠ	৬ষ্ঠ
সপ্ত	সপ্তম	৭ম
অষ্ট	অষ্টম	৮ম
নব	নবম	৯ম
দশ	দশম	১০ম

আজকাল আমরা বাংলায় সংস্কৃতের ভজকট এড়িয়ে সংখ্যাচিহ্নের পর 'ম' বা 'তম' বসিয়েই পূরণের কাজ চালাই। ষোড়শ (১৬শ), অষ্টাদশ (১৮শ), ষষ্টিতম (৬০তম), সপ্ততিতম (৭০তম), অশীতিতম (৮০তম), নবতিতম

(৯০তম), নবনবতিতম (৯৯তম)— এসব সংস্কৃত শব্দও দরকার মতো কাজে লাগানো হয়।

ভগ্নাংশ ½, অর্ধেক, আধ, আধা, ¼, একচতুর্থাংশ, সিকিভাগ। ⅔, তিনের দুই। ¾, তিন-চতুর্থাংশ, বারো আনা, পৌনে। ১½, দেড়। ২½, আড়াই। ৩½, সাড়ে তিন।

ফাইল-দুরস্ত

এবার একটু সেরেস্তার কাজ সেরে নেওয়া যাক।

প্রস্তাব মঞ্জুর। দেখলাম, ধন্যবাদ। আগেকার কাগজপত্র সমেত ফাইলে রাখুন। দেখার পর কথা বলে নিয়েছি। দেখার পর ফেরত পাঠালাম।

সই করে সিলমোহর দিয়ে পাঠানো হল।

এতেই সব বলা আছে। ফাইল পড়ে থাকছে।

যথাসম্ভব। যথাসাধ্য। ক্ষমতা অনুযায়ী। যে পর্যন্ত না।

এর বিপরীতে। উল্টে অন্য কিছু।

প্রাসঙ্গিক, সঙ্গত। অপ্রাসঙ্গিক, বেমানান, অসঙ্গত।

স্থানান্তরিত। বদ্‌লিযোগ্য। হস্তান্তর অবৈধ।

এখানে সে প্রশ্ন ওঠে না। অনুচিত। অযাচিত।

বিচারাধীন। বিবেচনাধীন। চিন্তাভাবনা চলছে।

এটা আমাদের বিষয় নয়। আমরা এর সঙ্গে যুক্ত নই।

পূর্ণ বিবরণ সহ। খুঁটিনাটি সব জানিয়ে।

বাদ না দিয়ে। ব্যতিক্রমহীনভাবে। নির্বিশেষে।

সদ্ব্যবহার করা। ঠিকমতন কাজে লাগানো।

বৈধ করা। আইনানুগ করা। সিদ্ধ করা।

সত্যতা প্রতিপাদন করা। সত্যতা যাচাই করা। সত্যায়িত বা প্রত্যয়িত করা।

আপনার। ভবদীয়। বিনীত।

এক কথায়

যা এক কথায় বলা যায়:

'পিপাসা' পান করার, 'জিজ্ঞাসা' জানবার, 'লিপ্সা' লাভ করার, 'জিগীষা' জয় করার, 'জিঘাংসা' হত্যা করার— ইচ্ছা।

দোলনার মতন দুলছে 'দোদুল্যমান', জ্বল্ জ্বল্ করছে 'জাজ্বল্যমান', দেখা

যাচ্ছে 'দৃশ্যমান', যা কাঁপছে 'কম্পমান', ক্রমেই বাড়ছে 'ক্রমবর্ধমান'।
যা চিন্তা করা যায় না— অচিন্তনীয়। যা বাক্যে প্রকাশ করা যায় না— অনির্বচনীয়। যা সহ্য করা যায়— সহনীয়। প্রশংসার যোগ্য— প্রশংসনীয়। নিন্দার যোগ্য— নিন্দনীয়। যা কষ্ট করে করতে হয়— কষ্টসাধ্য। সহজে করা যায়— সহজসাধ্য। করতে শ্রম লাগে— শ্রমসাধ্য।
বিজ্ঞান, দর্শন, ব্যাকরণ, ন্যায়, বেদান্ত চর্চা করেন যথাক্রমে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, বৈয়াকরণ, নৈয়ায়িক, বৈদান্তিক।
সব কিছু জানেন— সর্বজ্ঞ। সব কিছু জানার ভাব করে— সবজান্তা। মরতে বসেছে— মুমূর্ষু। সইতে পারে— সহিষ্ণু।
আজ আছে কাল নেই— অনিত্য। যা যুক্তিনির্ভর নয়— অযৌক্তিক। বেশি দূরে নয়— অনতিদূর। ঠান্ডা নয় গরমও নয়— নাতিশীতোষ্ণ।
যা দেওয়া যায় না— অদেয়। যা জানা যায় না— অজ্ঞেয়। যা দেখা যায় না— অদৃশ্য।

করিতকর্মা

আকাশের গতিক সুবিধের নয়। 'আমার কথাটি ফুরুলো' বলার আগেই পাততাড়ি না গুটিয়ে নিতে হয়।
যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। নিজেকে এই বুঝ দিয়ে কাজে লাগা যাক।
কাজ মানেই ক্রিয়া। বাংলা বাক্যে সব শব্দেরই টিকি বাঁধা ক্রিয়াপদে।
কে কী কী-দিয়ে কাকে কোথা-থেকে কবে কোথায়— এসব জানতে গেলে ক্রিয়াকেই জেরা করতে হবে। ক্রিয়াই দেবে কারকের হদিশ।
কিছু করিতকর্মা ক্রিয়া আছে, যাদের রকম রকম অর্থে ব্যবহার করা যায়। যেমন:

ওঠা

রোদ ওঠা, ভোরে ওঠা, বাসে ওঠা, দাঁত ওঠা, চোখ ওঠা, রং ওঠা, চুল ওঠা, ক্লাসে ওঠা, মন ওঠা, ছাদে ওঠা।

কাটা

পেন্সিল কাটা, সময় কাটা, টিকিট কাটা, পোকায় কাটা, পকেট কাটা, তাল কাটা, ছড়া কাটা, জল কাটা, জাবর কাটা, জিভ কাটা, জিনিস কাটা, পুকুর কাটা, চেক কাটা।

তোলা

জল তোলা, কানে তোলা, ট্রেনে তোলা, পটল তোলা, গায়ে হাত তোলা, শোধ তোলা, রব তোলা, মাথায় তোলা, শিকেয় তোলা, গাছে তোলা, কথা তোলা, পাট তোলা।

খাওয়া

মাথা খাওয়া, মার খাওয়া, দোল খাওয়া, টাল খাওয়া, গাল খাওয়া; হাওয়া খাওয়া, টাকা খাওয়া, ঘোল খাওয়া, চাকরি খাওয়া, খাপ খাওয়া, গ্যাস খাওয়া।

দেওয়া

মন দেওয়া, ধরা দেওয়া, জান দেওয়া, ধার দেওয়া, পাশ দেওয়া, ভাত দেওয়া, হাত দেওয়া, রোদে দেওয়া, ছাড় দেওয়া, মার দেওয়া, যক দেওয়া।

রাখা

মন রাখা, নজর রাখা, কথা রাখা, নাম রাখা, মান রাখা, জায়গা রাখা, লোক রাখা, জমা রাখা, মনে রাখা, বশে রাখা, খবর রাখা, সম্পর্ক রাখা, বজায় রাখা।

ধরা

গান ধরা, দোর ধরা, ধামা ধরা, বাজি ধরা, জল ধরা, মাথা ধরা, ধুয়ো ধরা, ট্রেন ধরা, ছাতা ধরা, বৃষ্টি ধরা, পায়ে ধরা, মুরুব্বি ধরা, আগুন ধরা, ভুল ধরা।

মারা

চাল মারা, চড় মারা, উঁকি মারা, গুল মারা, তালি মারা, মজা মারা, ছাপ মারা, জাত মারা, ভাতে মারা।

পড়া

ধরা পড়া, গায়ে পড়া, মনে পড়া, চোখে পড়া, পেটে পড়া, দর পড়া, পোকা পড়া, রাগ পড়া, অবস্থা পড়া।

বাংলাভাষার পাঁচ পা

মানুষের দু পা। গরুর চার পা। সাপের পা নেই। তবু কারও গুমর হলে, লোকে বলে, ও যেন সাপের পাঁচ পা দেখেছে।

সেদিক থেকে দেখলে, বাংলাভাষার কিন্তু সত্যিই পাঁচ পা: বিশেষ্য সর্বনাম ক্রিয়া বিশেষণ অব্যয়।

সেই সঙ্গে দরকার হলে তারা এক পদ থেকে অন্য কোনও পদে বদলিও হতে পারে।

পদান্তর

যেমন: ক্রিয়া থেকে বিশেষ্যে: পড়া শেষ। এখানে ওর আসার কথা। অনেক দিন ওর দেখা নেই। আমার যাওয়া ঠিক।

ক্রিয়া থেকে বিশেষণ: পাওয়া জিনিস। ধরা মাছ। খাওয়া ভাত। ফোটা ফুল। চেনা মুখ।

বিশেষ্য থেকে ক্রিয়া: জিনিসটা ও কোথাও থেকে হাতিয়েছে। বড়বাবু বললেন, 'তোমাকে জুতিয়ে লাশ করব'।

বিশেষণ থেকে বিশেষ্য: চারদিকে সবুজের সমারোহ। ওই শোনো আর্তের কান্না। উনি সুন্দরের পূজারী।

বিশেষ্য থেকে বিশেষণ: সত্যিই ও এক বিস্ময় বালক। বোম্বাই আম। রাম চিম্‌টি।

অব্যয় থেকে বিশেষণ: হঠাৎ আলোর ঝলকানি। আচ্ছা লোক বটে।

অব্যয় থেকে বিশেষ্য: এর মধ্যে কোনও কিন্তু নেই। জোর খবর।

লৌকিক শব্দ

আজ থেকে বছর ত্রিশ আগে পুরোপুরি একার চেষ্টায় শ্রদ্ধেয় কামিনীকুমার রায় দু খণ্ডে বাংলার সাধারণ মানুষের মৌখিক ভাষার একটি লৌকিক শব্দকোষ সঙ্কলন করেছিলেন। বইটির পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা হলে বাংলাভাষা সমৃদ্ধ হবে।

এই শব্দকোষে কী আছে, খুব সংক্ষেপে তার পরিচয় দিই।

প্রথম খণ্ডে: ১। ঘরবাড়ি। ২। গৃহ-সামগ্রী। চাষবাস (চাষাভূষা ও চাষবাসের প্রচলিত প্রথা); চাষ ও চাষীর যন্ত্রপাতি; জোতজমি, মাটির শ্রেণীভেদ; জমি তৈরি, ফসল উৎপাদন ও সংগ্রহ। ৩। উদ্ভিদ। ৪। জীবজন্তু (মাছ, মাছ ধরবার সরঞ্জাম; পশু; পাখি; সরীসৃপ ও কীটপতঙ্গ)। ৫। আচার-অনুষ্ঠান (বিবাহে লোকাচার; বিবিধ ব্রতাচার ও লোক-বিশ্বাস)। ৬। নামাবলী (সম্বন্ধসূচক; ব্যক্তিবাচক)।

দ্বিতীয় খণ্ডে: ১। মনুষ্যদেহ। ২। খাদ্য-পানীয়। ৩। বসনভূষণ। ৪। ব্যবসা ও পেশা। ৫। যানবাহন। ৬। বিশেষক শব্দ (আকৃতি-প্রকৃতি, স্বভাবচরিত্র,

ভাবভঙ্গি ইত্যাদি)। ৭। নৈসর্গিক (মাসবছর, দিনক্ষণ, আকাশবাতাস, খরা-গাজল, ঘুলিঘূর্ণি, হাওর-নিঙোর, দৈত্যদানা এবং এ সম্পর্কিত নানা লোকবিশ্বাস ও লোকাচার)। ৮। বিবিধ শব্দ (সাধারণ শব্দাবলী, শব্দদ্বৈত, ক্রিয়াপদ, খেলাধুলা, বাক্‌ধারা প্রভৃতি)। ৯। লৌকিক দেবদেবী ও পীর ফকির। এর সঙ্গে যুক্ত লোকাচার ও লোকশ্রুতি।
আপাতত গেয়ে রাখলাম। পরে এর অনেক কিছু কাজে লাগানো যাবে।

বাঁধাবুলি

এবার রপ্ত করা যাক কয়েকটা বোলচাল।
জগা খিচুড়ি। পিণ্ডি পাকানো।
জড়ভরত (অকেজো)। জবরজং (অগোছালো)। জলপানি (ছাত্রবৃত্তি)। জিভে জল সরা (লোভ হওয়া)।
জোঁকের মুখে নুন (শায়েস্তা)। জো-হুকুম (বশংবদ, স্তাবক)। জো-হুজুর (জী-আজ্ঞে)।
ঝাড়া-হাতপা (দায়মুক্ত, হালকা)। ঝাল ঝাড়া (গালমন্দ করে ক্ষোভ মেটানো)।
টনক নড়া (হুঁশ হওয়া)। টেণ্ডাই মেণ্ডাই (আস্ফালন)।
ঠোঁট-কাটা (স্পষ্ট বক্তা)। ঠোঁট ফোলানো (কাঁদার উপক্রম)।
ডালভাঙা ক্রোশ (দূরের পথ)। ডুব মারা (দেখা না দেওয়া)। ডেরাডাণ্ডা (তল্পিতল্পা)। ডুমুরের ফুল (যার দেখা মেলে না)।
আপাতত মুখে এবার কুলুপ দেওয়াই ভালো।

লেখার সময় যেন মনে থাকে

(১) 'সাথে' নয়, 'সঙ্গে'। 'পরে' নয়, 'ওপর'। 'পানে' নয়, 'দিকে'। 'ওনার', 'ওনাকে', 'ওনাদের' নয়— 'ওঁর', 'ওঁকে', 'ওঁদের'।
(২) 'অনুসূয়া' নয়, 'অনসূয়া'। 'উচিৎ' নয়, 'উচিত'। 'উৎকর্ষতা' নয়, 'উৎকর্ষ'। 'সখ্যতা' নয়, 'সখ্য'। 'ঐক্যমত' নয়, 'ঐকমত্য'।

একজোট হয়ে

সমাপিকা ক্রিয়ার কাজ বাক্যকে সম্পূর্ণ করা। তার সঙ্গে বাড়তি ক্রিয়া জুটে গেলে কাজটা আর একসেটে থাকে না। তাতে রং লাগে।

যখন বলি, 'সে যায়'— অর্থটা হয় সহজ সরল। কিন্তু 'সে যায়-যায়' বললে? ব্যাপারটা ঘোরালো হয়ে দাঁড়ায়।

ক্রিয়ার সঙ্গে ক্রিয়ার যোগফলে কী ঘটে, তার কিছু নমুনা দেখা যাক।

সে চলে যায়। সে চলে যাচ্ছে। সে চলে গিয়েছে। সে চলতে থাকে। সে চলে যেতে পারে। সে থেকে যায়। সে থেকে যাক। সে না গেলে না যাক। প্রায়ই সে গিয়ে থাকে। এই-গেল এই-গেল।

সে চলে গেল। সে চলে গিয়েছিল। সে চলে যাচ্ছিল। সে চলে যেত। একটু আগেই সে চলে যায়। সে চলে যেতে পারত। সে যেতে থাকল। সেখানেই হয়তো গিয়ে থাকবে।

সে চলে যাবে। সে যেতে থাকবে। আগে কখনও গিয়ে থাকবে। সে আজ থেকে যাবে। কাল সে চলে যাচ্ছে। সে যাবে-যাবে করছে।

এই যোগফলে শুধু সময় নয়, ঠারেঠোরে অনেক কিছুরই হদিশ মেলে।

মাঝখানে পাঁচিল তুলে দেওয়া। পাকা চুল তুলে দেওয়া। দোকান তুলে দেওয়া। ট্রেনে তুলে দেওয়া।

ওঠা পড়া। উঠে পড়া। উঠে পড়ে লাগা। ওঠা বসা। ওঠাউঠি। ওঠানামা। পেরে ওঠা। করে ওঠা। এঁটে ওঠা। ঠেলে ওঠা।

করে দেখা। দেখে চলা। দেখাদেখি করা। শুনে দেখা। ভেবে দেখা। দেখাশোনা। দেখে শুনে চলা।

পড়ে পাওয়া। পড়ি-মরি করা। প'ড়ে থাকা। পড়ো-পড়ো হওয়া। পড়াশুনো করা। পড়তে পারা। পড়ে ফেলা। পড়িয়ে নেওয়া।

বাঁধা ধরা। ধরে বেঁধে আনা। ধরা করা। ধর-কাট করা। ধরে থাকা। ধরে রাখা। ধরে দেওয়া। ধরে যাওয়া। ধরা পড়া।

ভাঙাগড়া। গড়াপেটা। ভেঙে ফেলা। গড়ে তোলা।

দল বাঁধা

শুধু ক্রিয়ার সঙ্গে ক্রিয়া নয়, বিশেষ্য আর বিশেষণের সঙ্গে জোট বেঁধেও ক্রিয়া নানা রকমের ভাব ফুটিয়ে তোলে। যেমন:

হাত লাগানো। হাত করা। হাত পোড়ানো। হাত পাতা। হাত বাড়ানো। হাত চালানো। মাথায় হাত বোলানো।
মাথা খাটানো। মাথা গলানো। মাথা খাওয়া। মাথা কাটা যাওয়া। মাথা হেঁট হওয়া। মাথার দিব্যি দেওয়া।
তাল দেওয়া। তাল করা। তালে থাকা। তালগোল পাকানো।
টাকা হওয়া। টাকা খাওয়া। বড় করা। বড় হওয়া। বিছানায় লম্বা হওয়া। ছোট করে দেখা।
এ সবই হল খুচরো কথা। গোটা ভাব প্রকাশ করতে গেলে চাই পুরো বাক্য। শব্দ বা পদ জুড়ে হয় বাক্য।
বাক্য হতে গেলে তার কম করে দুটো পদ চাই। দু-পায়ের কমে কোনও বাক্য চলতেই পারে না।

বাক্য হওয়া

ক্রিয়া ছাড়া কোনও বাক্য হয় না। ক্রিয়া থাকলে তার কর্তাও থাকবে।
বাক্যের দুটো ভাগ: উদ্দেশ্য আর বিধেয়। যার সম্বন্ধে বলা হয়, তা উদ্দেশ্য; যা বলা হয় তা বিধেয়। প্রথমটি বাক্যের বিষয়ী, দ্বিতীয়টি বাক্যের বিষয়।
কার সম্বন্ধে কী বলা হচ্ছে— বাক্যের কাজ তা বলে দেওয়া।
উদ্দেশ্যের ঘরে একটি কর্তা আর বিধেয় হিসেবে একটি ক্রিয়া— কেবল এই দিয়েই একটি ন্যূনতম বাক্য গড়া যায়। তেমনই নামপদের সঙ্গে বিশেষণ আর সম্বন্ধপদ জুড়ে একদিকে উদ্দেশ্যকে, অন্যদিকে ক্রিয়ার সঙ্গে কর্মপদ, বিশেষক আর সম্পূরক জুড়ে বিধেয়কে আরও বাড়ানো যায়।
ছোট বাক্য: শোভন পড়ছে।
এটাকে বাড়িয়ে লেখা যায়:
অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি নরহরিবাবুর নাতি শোভন বারান্দায় একটা চেয়ারে বসে খুব মন দিয়ে একটা গোয়েন্দাগল্পের বই পড়ছে।
এটাকে ভেঙে এভাবেও লেখা যায়:
নরহরিবাবু অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি। শোভন তাঁর নাতি। বারান্দায় একটা চেয়ারে সে বসে আছে। হাতে একটা গোয়েন্দাগল্পের বই। খুব মন দিয়ে সে পড়ছে।
এক নিশ্বাসে গড় গড় করে বলে যাওয়ার চেয়ে একটু থেমে থেমে বললে খেই হারাবার ভয় থাকে না।

মানানসই

বলবার কথা ঠিকমতো জানানোই হল বাক্যের কাজ। শব্দগুলোকে মানানসই করে বসাতে হবে।

সাধারণত আগে থাকে উদ্দেশ্য, পরে বিধেয়। দরকার হলে বিধেয়কে আগেও আনা যেতে পারে।

একটা বিশেষ ভাব ফুটিয়ে তোলা, জোর দিয়ে বলা, জিজ্ঞেস করা, একঘেয়েমি কাটানো— এইসব কারণে বাক্যের ভেতর কথাগুলোকে কখনও আগে কখনও পরে বসানো হয়।

যেমন: তখনও একটানা বৃষ্টি পড়ছে। তখনও বৃষ্টি পড়ছে একটানা। একটানা বৃষ্টি পড়ছে তখনও। তখনও পড়ছে একটানা বৃষ্টি। পড়ছে তখনও একটানা বৃষ্টি।

এ কথা বলতে হবে ('এ কথা'য় জোর)। বলতে হবে এ কথা ('বলতে হবে'তে জোর)।

একটা ঠ্যাং (পদ) এখানে এবং আরেকটা ঠ্যাং (পদ) অনেক দূরে ফেললে যেমন টাল সামলানো দায় হয়, তেমনই বাক্যের মধ্যে এক পদের সঙ্গে অন্য পদের ফারাক বেশি হলে অর্থবোধে ব্যাঘাত ঘটে। যেমন— মঙ্গলবার বাড়ি থেকে মাথায় ছাতা দিয়ে বেলা বারোটা নাগাদ বেরিয়েছিলাম সঙ্গে টাকা আর থলি নিয়ে স্টেশন পেরিয়ে পায়ে হেঁটে চারপাশের গাছগাছালি দেখতে দেখতে একেবারে সোজা বাখরাহাট বাজারে। বড় বেশি ঘুরিয়ে নাক দেখানো হল না কি?

নানা অর্থে

এবার কিছু বিশেষণের নানা অর্থে প্রয়োগের দিকে নজর ফেরানো যাক।

কাঁচা। কাঁচা রাস্তা (মাটির)। কাঁচা তরকারি (আরাঁধা)। কাঁচা কাজ (আনাড়ি)। কাঁচা রসিদ (প্রাথমিক)। কাঁচা বয়স (কম)। কাঁচা চুল (কালো)। কাঁচা পয়সা (নগদ)। কাঁচা হাত (অপটু)। কাঁচামাল (পণ্য তৈরির উপাদান)।

পাকা। পাকা বাড়ি (ইটের)। পাকা কাজ (পরিণত)। পাকা মাথা (অভিজ্ঞ)। পাকা সোনা (খাঁটি)। পাকা খাতা (চূড়ান্ত)। পাকা ছেলে (ডেঁপো)। পাকা দেখা (বিয়ে ঠিক হওয়া)। পাকা কথা (নিশ্চিত)।

বড়। বড়লোক (ধনী)। বড় মানুষ (শ্রদ্ধেয়)। বড়বাবু (প্রধান কেরানি, থানাদার)। বড় হওয়া (মানুষ হওয়া)। বড়ছেলে (জ্যেষ্ঠ)। বড় কথা (উঁচু

ভাব, লম্বাচওড়া)। বড় কুটুম (শ্যালক)। বড় একটা (বিশেষ)। বড় গলা (গর্ব)। বড় মন (উদার)।
ছোট। ছোট ভাই (অনুজ)। ছোট নজর (সঙ্কীর্ণ)। ছোট লোক (ইতর)। ছোট করা (সংক্ষেপ, মানহানি)। ছোট রেল (লাইট রেল)। ছোট হাজরি (প্রাতরাশ)। ছোট ঘর (নিচু বংশ)।

'ঢেলে সাজানো' নয়, 'ঢেলে সাজা'। 'অতলস্পর্শী' নয়, 'অতলস্পর্শ'। 'আকাঙ্খা' নয়, 'আকাঙ্ক্ষা'।

অ্যাটম অর্থে 'আণবিক' নয়, 'পারমাণবিক'। 'উল্লেখিত' নয়, 'উল্লিখিত'। 'ওতঃপ্রোত' নয়, 'ওতপ্রোত'।

রদ বদল

দুনিয়ায় সব কিছুই বদলায়।
আর সবকিছুর মতোই ভাষারও বদল হয়। জীবনের ধরন বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে ভাষারও ধরন বদলায়।
আগে বদলায় মুখের কথা। আস্তে আস্তে লেখার ভাষাতেও তার ছাপ পড়ে। যৌথ পরিবারে শোনা যেত মেজ্‌দা, সেজ্‌দা, ন'দা, রাঙাদা, ফুল্‌দা। কত্তাবাবা, ঠান্‌দি। ভাসুর, বড়্‌ঠাকুর, ভাদ্দরবৌ, বউমা। মাউইমা, তালুই মশাই। ছোট পরিবারে আজ আর এসবের চল নেই। তালপাতা, খাগের কলম। কাচপোকার টিপ, কাঠের খড়ম। পাদোদক, থুতকুড়ি। বারবেলা, অশ্লেষা, মঘা। হাঁচি, টিকটিকি, দিক্‌শূল। উঠে যেতে বসেছে আট কলাই, বেটেরা, হাতেখড়ি, মুখেভাত। গ্রামেগঞ্জে থাবা বসায় শহুরে লব্‌জ।
ভাষার ভালোমন্দ, নির্ভর করে তাকে কাজে লাগানোর ওপর। শুধু আদিখ্যেতা আর আহামরি করে কোনও ভাষাকে বাঁচানো যায় না। সে ভাষা রবীন্দ্রনাথেরই হোক আর কালিদাসেরই হোক।

মানুষের হাতধরা

মানুষের হাত ধরে চলে তার মুখের ভাষা। হাত ছেড়ে দিলে ভাষা পথ হারায়। এইভাবে কত ভাষা যে হারিয়ে গেছে, তার ঠিক নেই।

যে ভাষা বহাল আছে, তার মধ্যেও চলেছে সমানে ভাঙাগড়া।
এক সময় গরু আর ধান— এই ছিল গুণ আর ধনাঢ্যতার মাপকাঠি। গো শব্দ থেকে গোষ্ঠ, গোষ্ঠী, গুণ, গৌরব— তৈরি হয়েছে এমনই বিস্তর শব্দ। যার ধান আছে সে ধনবান।
যে-কোনও দেশের উন্নতির মাপকাঠি আজ আর পশুপালন বা চাষবাস নয়। সভ্যতার মূলমন্ত্র এখন যন্ত্র। হালবলদ নয়— ট্র্যাক্টর। শুভঙ্করী নয়— কম্পিউটার।

কাজ ফুরোলে

পুরোনো শব্দ অকেজো হয়ে গিয়ে তার জায়গা নিচ্ছে নতুন নতুন শব্দ। কিংবা নতুন কাজে লাগানো হচ্ছে পুরোনো কথাগুলোকে।
'কল্কে না পাওয়া'— অর্থাৎ পাত্তা না পাওয়া।
শহরে তো বটেই, গ্রামেও এখন কল্কের দেখা পাওয়া দুর্ঘট।
হুঁকো আর আলবোলার জায়গা নিয়েছে এখন ঝাড়া-হাতপা-হওয়া বিড়ি সিগারেট চুরুট পাইপ।
তবু খোলনলচে সমেত আমাদের ভাষায় এখনও টিকে রয়েছে এমনকি অদৃশ্য হওয়া 'হুঁকোবরদার' শব্দটিও।
কালের ঝড়ো-হাওয়ায় ধুতি প্রায় উধাও হয়েছে। সেইসঙ্গে বিদায় নিয়েছে 'নরুন পাড়'. 'কোরা' 'কাছা' 'কোঁচা' 'মালকোঁচা' 'ফরাসডাঙা' 'গিলে'। 'আনকোরা' টিকে গেছে 'নতুনে'র হাত ধরে। শালোয়ার-কামিজের সঙ্গে লড়াই করে শাড়ি আর কতদিন টিকবে কে জানে! 'শান্তিপুরি' 'টাঙাইল' 'জামদানি' 'ঢাকাই' 'ধনেখালি' 'পাছাপেড়ে' 'কস্তাপেড়ে' 'নয়ন সুখ' 'মাটাপালাম'— কী ভবিষ্যৎ এদের? মাথার চুলও তো ছোট হয়ে আসছে। 'এলোকেশ' 'শিথিল কবরী' 'ধম্মিল্ল' 'ধুদ্ধুড়ি' 'চুড়ো' 'কানড়া' 'ঝুঁটি' 'বিনুনী' 'বেড়াবেণী' 'পাটি খোঁপা'— এদেরও দিন ঘনিয়ে আসবে। কপালের টিপ আর সিঁথির সিঁদুর? কাজললতা? তরল আলতা?
বাঁচতে গেলে যখন যা লাগে ভাষাতেও শুধু কি তাই থাকে? এটা হওয়া স্বাভাবিক হলেও বাস্তবে পুরোপুরি তা ঘটে না। যা নেই তা দিয়ে আমরা মনের সাধ মেটাই। ইচ্ছেগুলো পূরণ করি। আকাশকুসুম আর লালকমল নীলকমল ছাড়া আমাদের চলে না। চাই পক্ষীরাজ ঘোড়া আর মন পবনের নাও। শুধু এরোপ্লেন হেলিকপ্টার ইস্টিমার সাবমেরিনে শানায় না।

হাল ফেরানো

কথার পিছনে ফিঙে হয়ে লেগে থাকলে এও দেখা যায় যে, ফেলে-দেওয়া কথাগুলোকে ফের তুলে বেছে নতুন কোনও কাজে লাগানো হচ্ছে। 'দিগরে' 'পানে' 'পরে' 'বাগে' 'বিনে' 'সাথে'— এসবই যাওয়ার মুখে। বিশেষ করে লেখার বৃত্তে। 'করিবেক' 'তত্রাচ' 'দ্বারা' 'কুত্রাপি' 'কদাপি' গেলেও কোনওরকমে টিকে আছে 'কস্মিন' 'কদাচিৎ' 'কিঞ্চিৎ'। শূন্যস্থান পূর্ণ করছে নতুন নতুন শব্দ। সেইসঙ্গে ভোল বদ্‌লে থেকে যাচ্ছে সাবেক কিছু শব্দ।

মনের ভাব ঠিকমতো ফোটাতে গেলে চাই বাছাই-করা লাগসই শব্দ। যথাস্থানে সার্থক শব্দ জুড়ে তৈরি হয় সার্থক বাক্য। ধানাই পানাই না করে বলতে হবে সংক্ষেপে সোজাসুজি। কথা জড়িয়ে না যায়। বুঝতে ভুল না হয়।

ঝাড়াই বাছাই

গান গেয়ে বলব 'গগনে গরজে মেঘ'। কিন্তু গদ্যে লিখব, 'আকাশে মেঘ ডাকছে'। আকাশের সমার্থক শব্দ অনেক। কিন্তু তার মধ্যে কটাই বা এখন আমরা ব্যবহার করি। বড়জোর 'গগনচুম্বী' 'বিমানঘাঁটি' 'নভশ্চর' 'ব্যোমযান' 'অভ্রভেদী'।

আমরা কেউ বলি 'জল'। কেউ 'পানি'। দরকার পড়লে বলি 'পাদোদক' 'কারণবারি' 'সলিলসমাধি' 'লবণাম্বু'। মেঘের ডাকনামেই কাজ চলে যায়। 'নীরদ' 'জলদ' 'বলাহক' 'জলধর'— এসব পোশাকি নামের বড় একটা দরকার হয় না।

পৃথিবীর কত নাম। 'জগৎ' 'বিশ্ব' 'সংসার' 'ধরা' 'চরাচর' 'ধরিত্রী' 'ধরণী' 'দুনিয়া' 'মেদিনী' 'বসুমতী' 'বসুন্ধরা' 'ইহলোক' 'ভুবন'। আরও কত কী। বলে থাকি 'ভূখণ্ড' 'ভূভারত' 'ভূমণ্ডল' 'ভূতল' 'ভুবন' 'ক্ষিতি' 'পৃথ্বী'। জেনে রাখি 'মহী' 'ইরা' 'ইলা' 'নিখিল' 'অখিল' 'বসুধা'। কিন্তু না জানলেও চলে 'ক্ষণা' 'পিষ্টপ' 'ক্রোড়কান্তা' 'বীজসূ' 'গো' 'দ্বিরা' 'পারা' 'ক্ষৌণি' 'ইরা' 'আদ্যা' 'গন্ধবতী'।

সূর্যের সমার্থক 'রবি' 'ভাস্কর' 'ভানু' 'তপন' 'আদিত্য' 'অর্ক' 'অরুণ' 'মার্তণ্ড' 'দিবাকর' 'মিত্র' 'সবিতা' 'অর্যমা' 'ইতু' 'আফতার' 'পূষণ'। না জানলেও চলে 'অজিহ্মগ' 'অজিহ্মগ' 'গভস্তিহস্ত' 'ত্বিষামীশ' 'ব্রধ্ন' 'বিকর্তন' 'খমণি'।

আরবিভাষায় উটের আছে শত নাম।
এক সময়ে প্রকৃতিকে খুঁটিয়ে জানার জন্যে এসব শব্দ গড়বার দরকার হয়েছিল।
যেমন কাজের সময় কাজী, কাজ ফুরোলে পাজি। দরকার মিটে গেলে শব্দেরও হয় সেই হাল।

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাশিক্ষা

বঙ্কিমচন্দ্র শুধু যে বড় লেখক ছিলেন, তাই নয়; কারা লিখবে এবং কেমন করে লিখবে, সে বিষয়েও তিনি স্পষ্ট করে তাঁর মত ব্যক্ত করেছেন। তাঁর লেখা 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' 'লিখিবার ভাষা' আর 'সহজ রচনাশিক্ষা'— এই কয়েকটি প্রবন্ধ থেকে কিছু উদ্ধৃতির সঙ্গে সংক্ষেপে তাঁর বক্তব্য তুলে ধরতে চাই।
লেখার উদ্দেশ্য হবে মানুষের ভালো করা আর সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলা। নাম করা বা টাকা করা নয়। ভালো লিখলে, না চাইলেও নাম হবে। উন্নততর সমাজে টাকা পেয়েও ভালো লেখা যায়।
ধীরে সুস্থে সময় নিয়ে মেজেঘষে তবেই লেখা ছাপতে দেওয়া উচিত।
লেখায় হতে হবে অকপট সরল স্বচ্ছন্দ। আর কারও মতো না হয়। অহেতুক রসালঙ্কার যেন সৌন্দর্য আর আস্বাদনে বিঘ্ন না ঘটায়। বিনা প্রমাণে কিছু বলা না হয়।
'সহজ রচনা শিক্ষা'র গোড়ায় বলা হয়েছে: 'রচনা অতি সহজ। মুখে মুখে কহিবার সময়েও আমরা সাজাইয়া কথা কই, তাহা না করিলে কেহ আমাদের কথা বুঝিতে পারিত না। অতএব যে মুখে মুখে কথোপকথন করিতে পারে, লিখিতে জানিলে সেও অবশ্য লিখিত রচনা করিতে পারে। তবে যেমন সব কাজেই, তেমনি লেখার জন্যেও চাই কিছু গুণপনা, যা রপ্ত করতে হয়।

রচনার গুণাগুণ

বঙ্কিমচন্দ্র বলছেন : 'রচনার চারিটি গুণ বিশেষ করিয়া শিখিতে হইবে। এই চারিটির নাম : (ক) বিশুদ্ধি, (খ) অর্থব্যক্তি, (গ) প্রাঞ্জলতা, (ঘ) অলঙ্কার।'
(ক) বিশুদ্ধির ক্ষেত্রে তিনি জোর দিয়েছেন বানান, ব্যাকরণ আর শিষ্ট বচনের

ওপর। বানানে আর ব্যাকরণে পুরোনো অনেক নিয়ম এখন আর খাটে না। মুখের অজাত-কুজাত অনেক শব্দ কালক্রমে কলমের আঁচড়ে জাতে উঠেছে। চলমান ভাষার এটাই ধর্ম। এ নিয়ে পরে আরও বলা যাবে।

(খ) অর্থব্যক্তি। সঠিক শব্দে মনের ভাব প্রকাশ করা। তেমন শব্দ নিজেদের না থাকলে পরের কাছ থেকে নিতে হবে কিংবা একই গোত্রের কোনও সমার্থক বাংলা শব্দকে বিশেষ অর্থে কাজে লাগাতে হবে।

(গ) প্রাঞ্জলতা। বঙ্কিমচন্দ্র বলছেন : 'প্রাঞ্জলতা রচনার বড় গুণ। তুমি যাহা লিখিবে, লোকে পড়িবামাত্র যেন তাহা বুঝিতে পারে।'

১। একটি বস্তুর হয়তো অনেক নাম। যেমন আগুনের নাম অগ্নি, অনল, হুতাশন, হুতভুক, বৈশ্বানর, বায়ুসখা। আরও কত কী। কিন্তু আগুন বা অগ্নি বললে এক ডাকে সবাই চিনবে।

২। 'অনর্থক কতকগুলা সংস্কৃত শব্দ লইয়া সন্ধি-সমাসের আড়ম্বর করিও না—অনেকে বুঝিতে পারে না।'

৩। 'অনর্থক কথা বাড়াইও না। অল্প কথায় কাজ হইলে, বেশী কথার প্রয়োজন কি?'

৪। 'জটিল বাক্য রচনা করিও না। অনেকগুলি বাক্য একত্র করা হইলে বাক্য জটিল হয়।.... জটিল বাক্যটি ভাঙিয়া ছোট ছোট সরল বাক্যে সাজাইবে।'

৫। 'যেখানে স্থূল বাক্যটি বুঝিতে কঠিন, সেখানে উদাহরণ প্রয়োগে বড় পরিষ্কার হয়।'

৬। 'স্থূল বাক্যটি বড় সংক্ষিপ্ত হইলে অনেক সময় বুঝিবার কষ্ট হয়। এমন স্থলে সম্প্রসারণ করিবে।'

(ঘ) অলঙ্কার। 'অলঙ্কার ধারণ করিলে যেমন মানুষের শোভা বৃদ্ধি পায়, অলঙ্কার ধারণ করিলে রচনারও সেইরূপ শোভা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু অলঙ্কার প্রয়োগ বড় কঠিন।'

এ নিয়ে পরে কথা বলা যাবে। এখন দেখা যাক লেখার প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র আর কী বলেছেন।

সাধুভাষা

'...কিছুকাল পূর্বে দুইটি পৃথক ভাষা বাঙ্গালায় প্রচলিত ছিল। একটির নাম সাধুভাষা; অপরটির নাম অপর ভাষা। একটি লিখিবার ভাষা, দ্বিতীয়টি কহিবার ভাষা। ...গদ্য-গ্রন্থাদিতে সাধুভাষা ভিন্ন অন্য কিছু ব্যবহার হইত

না। যাঁহারা ইংরেজিতে পণ্ডিত, তাঁহারা বাঙ্গালা লিখিতে পড়িতে না জানা গৌরবের মধ্যে গণ্য করিতেন। সুতরাং বাঙ্গালায় রচনা ফোঁটা-কাটা অনুস্বারবাদীদিগের একচেটিয়া মহল ছিল।...

'...টেকচাঁদ ঠাকুর প্রথমে এই বিষবৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করিলেন। ... তিনি ভাবিলেন, বাঙ্গালার প্রচলিত ভাষাতেই বা কেন গদ্যগ্রন্থ রচিত হইবে না?... সেইদিন হইতে বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি।'

'...স্থূল কথা, সাহিত্য কি জন্যে ? গ্রন্থ কি জন্যে? যে পড়িবে, তাহার বুঝিবার জন্যে। না বুঝিয়া, বহি বন্ধ করিয়া পাঠক ত্রাহি ত্রাহি করিয়া ডাকিবে, বোধহয় এ উদ্দেশ্যে কেহ গ্রন্থ লিখে না।...'

'...বিষয় অনুসারেই রচনার ভাষার উচ্চতা বা সামান্যতা নির্ধারিত হওয়া উচিত। রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রয়োজন সরলতা এবং স্পষ্টতা।'

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, সরল স্পষ্ট কথা যদি সুন্দর করে বলা যায়, তাহলে হবে সোনায় সোহাগা। কিন্তু সৌন্দর্যের খাতিরে সোজা কথা পেঁচিয়ে বলা ঠিক নয়। নেহাৎ অখাদ্য কুখাদ্য ছাড়া, কোনও শব্দই পাঠকের পাতে দেবার অযোগ্য নয়।

পিছুটান

কয়েকটা কথা এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার।

মনে মনে চাইলেও বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু সাধুভাষার গণ্ডি ছেড়ে খুব বেশি এগোতে পারেননি।

তাঁর মতে, 'করছি-করেছি' লেখা চলবে না। লিখতে হবে 'করিতেছি-করিয়াছি।' 'মূর্খামি' 'আহাম্মুখি' অশুদ্ধ। শুদ্ধ ভাষায় হবে 'মূর্খতা' 'অহম্মুখতা'।

মুখের লাগাম বজায় রেখে তিনি চেয়েছিলেন বাংলা ভাষায় সংস্কৃতের রাশটাকে আলগা করতে।

বাবু শ্যামাচরণ

বঙ্কিমের লেখা থেকে আমরা এও জানতে পারি যে, সে সময়েও কেউ কেউ চেয়েছিলেন আরও কয়েক পা এগোতে।

যেমন, বাবু শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়। বঙ্কিমচন্দ্র স্বীকার করেছেন : 'তাঁহার মতগুলি অনেক স্থলে সুসঙ্গত এবং আদরণীয়। অনেক স্থলে তিনি কিছু

বেশী গিয়াছেন। বহুবচন জ্ঞাপনে গণ শব্দ ব্যবহার করার প্রতি তাঁহার কোপদৃষ্টি। বাঙ্গালায় লিঙ্গভেদ তিনি মানেন না। পৃথিবী যে বাঙ্গালায় স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দ, ইহা তাঁহার অসহ্য। বাঙ্গালায় সন্ধি তাঁহার চক্ষুঃশূল।... এইরূপ তিনি বাঙ্গালা ভাষার উপর অনেক দৌরাত্ম্য করিয়াছেন।' তাঁর কিছু কিছু মত যে সমর্থনযোগ্য বঙ্কিমচন্দ্র সে কথাও জানাতে ভোলেননি। সাধুভাষাকে ধাপে ধাপে সরিয়ে প্রায় সর্বত্রই এখন চলিত ভাষার চলন হয়েছে। বিশেষ ক্রিয়াকাণ্ডে ছাড়া সাধুক্রিয়ার খুব একটা দর্শন মেলে না। সর্বনাম, অব্যয়, ক্রিয়া আর যাবতীয় শব্দের কথ্য রূপ—এই নিয়েই চলিত ভাষার ঘরসংসার।

সব সত্ত্বেও বলা আর লেখা কখনই এক হয় না। মুখে বলা আর লিখে বলার মধ্যে পার্থক্য একটা থেকেই যায়।

লাগসই শব্দ

লিখতে গিয়ে প্রায়ই আমাদের বাঁশবনে ডোম কানার দশা হয়। কোন শব্দটা বসাব?

একই বস্তু বা একই ভাব বোঝাতে রকমারি শব্দ আছে। যাকে আমরা বলি প্রতিশব্দ বা সমার্থক শব্দ।

একটু খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যায়, দুটি প্রতিশব্দে মিল থাকলেও তারা হুবহু এক নয়।

যেমন গাছের নানা প্রতিশব্দ: উদ্ভিদ, বৃক্ষ, তরু, পাদপ, দ্রুম। সেইসঙ্গে বর্তমানে অচলিত আরও কিছু প্রতিশব্দ যেমন: পত্রী, স্কন্ধী, শাখী, পল্লবী, অগচ্ছ।

বড় গাছ বলতে এখনও ব্যবহার হয়— মহীরুহ, বনস্পতি।

মাঝে মধ্যে 'বৃক্ষ' 'তরুলতা' 'কল্পদ্রুম' ব্যবহার করলেও, 'গাছ' আর 'উদ্ভিদ' দিয়েই আমাদের রোজকার কাজ চলে যায়।

আকাশকে 'অম্বর' 'অভ্র' 'ব্যোম' 'নভস্' 'উড়ুপথ' 'দ্যৌ' 'রোদসী' না বলে আকাশ বলতেই আমরা বেশি পছন্দ করি। সময়ে সময়ে কাজে লাগে 'অন্তরীক্ষ' বা 'শূন্য'। মুখ বদলাতে মাঝে মাঝে 'অভ্রভেদী' 'নভশ্চর' 'দ্যুলোক'। ব্যোম কিংবা বিমান।

আমরা যখন যেভাবে বাঁচি, তখন সেইমতো গড়ে ওঠে আমাদের ভাষার

শব্দভাণ্ডার। অদরকারি শব্দগুলোকে ফেলে দিয়ে যেখান থেকে হোক জুটিয়ে নিই কাজে-লাগা নতুন শব্দ।

টিভি, ফ্রিজ, কম্পিউটার, ইন্টারনেট, ফ্যাক্স, ই-মেল, টেপরেকর্ডার, ভিডিও, এস টি ডি— গ্রামগঞ্জেরও হালচাল বদলে দিচ্ছে।

টেলিভিশন হয়েছে টিভি। শুধু 'দূরদর্শনে' শানাচ্ছে না। বাংলার 'ছোট পর্দা' কথাটাও চলছে। লোকমুখে কালক্রমে কোন কথা কী আকার নেবে কেউ বলতে পারে না। সিনেমাকে এখন আর কেউ বায়োস্কোপ বলে না। 'চলচ্চিত্র' হয়ে গেছে শুধু 'ছবি'। এখন আর শোনাই যায় না 'টকি' কিংবা 'সবাকচিত্র'। শব্দের এই উদয়াস্তের ভেতর দিয়ে ভাষার দিনবদল হয়।

শব্দ এক থাকলেও ক্রমে তার অর্থ বদলে যেতে পারে।

মহাজন এখন আর মহৎ জন বা ধার্মিক পুরুষ নন। এখন সে ব্যক্তি হয় সুদের কারবারি, নয় আড়তদার। ইতর ছিল 'অপর', এখন 'নীচ' বা 'অধম'। 'জলপান' বা 'জলযোগ' বলতে হাল্কা খাবার। বড়সড় গ্রাম ছিল 'গণ্ডগ্রাম', এখন হয়েছে অজ পাড়াগাঁ। যাকে 'পয়সাওয়ালা' বলি, তার অনেক টাকা আছে।

মনে-মুখে এক হওয়া

মনে-মুখে কাজে-কথায় এক না হওয়ায় শব্দের ওপর লোকের ভক্তি চটে যাচ্ছে। 'খাঁটি নির্জলা দুধে' কতটা জল, 'নির্ভেজাল তেলে' কীসের মেশাল আছে আমরা জানতে চাই। 'আদি ও অকৃত্রিম' 'একমাত্র বিশ্বস্ত' 'হস্ত দ্বারা স্পৃষ্ট নয়' 'জলের দাম' 'বিফলে মূল্য ফেরত'— এসব কথায় কেউই আর কান দেয় না।

লেখককে হতে হবে সৎ। নইলে পাঠক খোলা মনে তাঁকে নেবে না। শাক দিয়ে মাছ ঢাকলে কিংবা আণ্ডায় গণ্ডা গুনলে পাঠকের চোখে তা ধরা পড়ে যাবে।

লিখতে হবে মন খোলসা করে। আমতা আমতা না করে, চিবিয়ে চিবিয়ে না বলে সাদা কথা সিধেভাবে বলতে হবে। ইনিয়ে বিনিয়ে বলতে গিয়ে ধানাই পানাই করলে কথার দাম থাকে না।

লিখতে হবে পুরোপুরি নিজের মতো করে। তাতে চটকদারি লোক-দেখানো ভাব না থাকে। লেখাটা যেন হয় মুখে কথা বলার মতো। লেখায় পরের মুখে ঝাল খাওয়া কিংবা পরের বুলি আওড়ানো একেবারেই ঠিক নয়।

যতটুকু দরকার

যতটুকু দরকার, শুধু ততটুকুই বলতে হবে। তার বেশিও নয়, কমও নয়।

(১) কোনও বাক্যে অযথা শব্দের বোঝা চাপানো ঠিক নয়।

—সব দিক দিয়ে বিষয়টি আমরা সার্বিকভাবে বিবেচনা করে দেখছি। (হয় 'সব দিক দিয়ে', নয় 'সার্বিকভাবে'— দুইয়ের একটি লেখাই যথেষ্ট।)

—এ বিষয়ে সংশয় নেই যে, কোনও কোনও রাজনৈতিক নেতা দাগী অপরাধীদের সঙ্গে সন্দেহাতীতভাবে যুক্ত। অনায়াসে 'এ বিষয়ে সংশয় নেই যে' কিংবা 'সন্দেহাতীতভাবে' বাদ দেওয়া যায়।

—স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে অধুনা এই শহরেই ওঁরা পাকাপাকিভাবে বসবাস করেন। 'স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে' কিংবা 'পাকাপাকিভাবে' স্বচ্ছন্দে বাদ দেওয়া যায়।

ঠিকঠাক

(২) ভাসা-ভাসাভাবে না বলে স্পষ্ট এবং নির্দিষ্ট করে বলতে হবে।

— এ বিষয়ে আপনারা নিঃসন্দেহ থাকুন যে, আপনাদের যা যা দাবি আমরা তা পূরণ করার বিষয়টি বিবেচনা করে দেখব। (আপনাদের যাবতীয় দাবি অবশ্যই আমরা বিবেচনা করব।)

— আশা করি, প্রত্যেক বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ এই মহৎ কাজে তাঁদের সাহায্যের হাত প্রসারিত করবেন। (আশা করি, সমস্ত বিবেকবান মানুষই এ কাজে সহযোগী হবেন।)

জানাচেনা

(৩) খটমট শব্দের বদলে সবার জানা আটপৌরে শব্দ ব্যবহার করা ভালো।

— ছেলেটির প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে বহু লোকের প্রাণরক্ষা হয়। (ছেলেটির উপস্থিতবুদ্ধিতে বহু লোকের প্রাণ বাঁচে।)

— অন্তঃপুরবাসিনীরা সে যুগে ছিলেন অসূর্যম্পশ্যা। (ঘরের মেয়েরা সে যুগে ছিলেন পর্দানশিন।)

বেশি ব্যবহারের ফলে কোনও কোনও শব্দের দশা হয় ঘষা পয়সার মতো। ছেঁদো কথায় লোকে কান দিতে চায় না।

একেক সময়ে একেকটা শব্দ লেখকদের যেন পেয়ে বসে। দৈনিকপত্রের পাতায় একটু চোখ বোলালেই হাল আমলের এইসব মার্কামারা শব্দ নজরে পড়বে।

যেমন: খবরে প্রকাশ (জানা যায়); ফলশ্রুতি (ফল, পরিণাম); জেরে (ফলে); পরিপ্রেক্ষিত (পটভূমি, পশ্চাৎপট, পরিমণ্ডল, পরিপার্শ্ব); সাক্ষাৎকার (প্রশ্নোত্তর, মোকাবিলা, দেখা হওয়া); ওয়াকিবহাল (অভিজ্ঞ, সুবিদিত); প্রতিক্রিয়া (মনোভাব)।
একঘেয়ে কথা না লিখে মাঝে মাঝে একটু মুখবদল করা ভালো।

ভাষার একক বাক্য

ভাষার একক হল বাক্য।
এমনিতে অর্থ থাকলেও শব্দ ভেসে বেড়ায়। বাক্য তাকে ঠাঁই দিলে তবেই সে পদে ওঠে। পায় ক্রিয়া বিশেষ্য বিশেষণ ক্রিয়া-বিশেষণ বা অব্যয়— এই রকমের কোনও-না-কোনও পদ।
সব শব্দ এক রকমের নয়। গড়ন, অর্থ, উৎস— এই দিয়ে তাদের জাতবিচার করা হয়। এক, মৌলিক বিজোড় শব্দ; যা ভেঙে আলাদা করা যায় না (যেমন: জল, মন, চল, গুণ, লঘু, বন)। দুই, প্রত্যয়যুক্ত (যেমন: জলীয়, মানস, চালক, গুণী, লঘুতা, বন্য) এবং সমাসবদ্ধ (যেমন: জলস্থল, মনমরা, চালাচালি, গুণমান, লঘুগুরু, বনফুল)।
অর্থমূলক শব্দ তিন রকমের। এক: যেসব শব্দের গোড়াকার অর্থ পরেও একই আছে। পাখি (যার পাখা আছে), পাঠক (যে পাঠ করে), দোলনা (যা দোলে)। দুই: যেসব শব্দের গোড়াকার অর্থ কালক্রমে বদলে গেছে। যেমন: কুশল — গোড়ায় বোঝাত 'যে কুশ আনে'; এখনকার অর্থ 'নিপুণ'। প্রবীণ— 'বীণা বাজানোর হাত যার পাকা'; এখনকার অর্থ 'বয়স্ক' বা 'পাকা মাথা'। তিন: শব্দের সম্ভাব্য একাধিক অর্থ থেকে পরে কেবল একটি অর্থই দাঁড়িয়ে গেছে। যেমন: যা কিছু পাঁকে জন্মায়, তাই 'পঙ্কজ'; পরে একমাত্র পদ্মকেই বলা হয়েছে 'পঙ্কজ'। যা তাড়াতাড়ি যায়, তাই 'তুরঙ্গ'; কিন্তু এখন কেবল ঘোড়াকেই বলা হয় তুরঙ্গ।

কোথা থেকে এল

এরপর আসে কোন শব্দ কোথা থেকে কেমন করে এল। এক কথায়, শব্দের উৎস। তৎসম (মানব, দর্শন, আগন্তুক), অর্ধতৎসম (রোদ্দুর, সোয়াস্তি), তদ্ভব (হাত, আঁচল, আবরু), দেশজ (ঢেঁকি, কুঁজো, ঢেউ, মুড়ি), বিদেশাগত (হাওয়া,

কোমর, রেলিং, কাফে, আলমারি, ইস্ক্রুপ, দারোগা, চা, হাসনুহানা, লুঙ্গি)। সেইসঙ্গে আছে সারা ভারতের আর্য-অনার্য নানা গোষ্ঠীর ভাষাসূত্র।

কোন ভাষার কর্মক্ষমতা কেমন, তা বোঝা যায় তার শব্দসম্পদ দিয়ে। কাজেকর্মে যারা পিছিয়ে, তাদের ভাষার জোরও কম হয়।

শব্দ যেন কেবল শুকনো মুখের বুলি না হয়, লিখতে গিয়ে তা খেয়াল রাখা দরকার। যে কথা বলে বলে ঘাঁটা পড়ে গেছে, সে কথায় কাজ হয় না। নিষ্প্রাণ যান্ত্রিক কথায় পাঠকের সাড়া মেলে না।

বাংলা কাগজের লেখায় আর নেতাদের কথায় হরহামেশা থাকে এইসব ছেঁদো বুলির হরির লুট।

বিশ্বায়ন, ধর্ম-নিরপেক্ষ, মৌলবাদী, মানবাধিকার, কর্মসংস্কৃতি— এসব ধরতাই শব্দে। শাঁসের চেয়ে খোসাটাই বেশি বড় হয়ে ওঠে। যেন বলতে হয় তাই বলা। তাতে কাজের কাজ ছাই হয়।

বিশ্বসংসার আজ আমাদের দুনিয়াদারির ক্ষেত্র। ধর্মনিরপেক্ষ বলতে বোঝায়, যে রাষ্ট্র কোনও ধর্মের আওতাভুক্ত নয়— যার চোখে সব ধর্মই সমান। মৌলবাদীরা হল ধর্মোন্মাদ। যাদের আমরা বলে থাকি গেঁড়ে-হিন্দু কিংবা কাটমোল্লা। মানবাধিকার তো মানুষের হক। যা মানুষের না হলেই নয়। কর্মসংস্কৃতির লক্ষ্য কাজে রুচি আনা।

হক কথা

মন-গড়া বুলি আর আমদানি-করা ভাব দিয়ে লোকের মন কাড়া যায় না।

বাংলাভাষার ওপর সবচেয়ে বেশি ছাপ পড়ে বাংলা খবরের কাগজের। কাগজের পাতা থেকে তা উঠে আসে পড়ার বইতে।

কাগজের প্রধান কাজ খবর দেওয়া। সে খবর ঘড়ি ধরে চট-জলদি লিখতে হয় বলে তাতে প্রায়ই থাকে 'ধর পেরেক মার হাতুড়ি'র ভাব। অন্য লেখাগুলোতেও প্রধানত থাকে তাৎক্ষণিক সময়ের কথা। যদিও তা লেখা হয় আরেকটু বেশি সময়, আরেকটু বেশি জায়গা নিয়ে।

কাগজের লেখায় অনেক সময়ই একটা ছাঁচে-ঢালা ভাব এসে যায়। 'খবরে প্রকাশ', 'বিশ্বস্ত সূত্রে', 'ওয়াকিবহাল মহল', 'জোর তদন্ত' গোছের শব্দ চোখে পড়লেও আমরা তার পাশ কাটিয়ে যাই।

খেয়াল করে কিছু শব্দের এদিক ওদিক করলে অবশ্যই বাঁধাবুলির হাত এড়ানো যায়।

আবার, অনেক সময়ই এর পিছনে থাকে দায় এড়ানোর মনোভাব। হাতে যুক্তিপ্রমাণ থাকলে কোনও কথা জোর দিয়ে বলার সাহস হয়। কারও কারও স্বার্থে ঘা দিলেও তখন রেখে ঢেকে বলার দরকার হয় না। কোনও সমালোচক যখন লেখেন 'বইটি প্রশংসার দাবি রাখে', তখন বোঝা যায় তিনি 'প্রশংসনীয়' বলার দায় এড়িয়ে যাচ্ছেন।

সোজাসাপ্টা বলতে গেলে অনেক সময়ই আমাদের হাতের মজুত কথায় কুলোয় না। তার জন্যে কথা হাতড়াতে হয়। সচরাচর যেসব কথা অভিধানে পাওয়া যায় না, কামিনীকুমার রায়ের 'লৌকিক শব্দকোষ' থেকে তেমন কিছু শব্দ তুলে দিচ্ছি—

লোকমুখে

কড় (আঙুলের গাঁট। কড় গোনা)। কলজে পুরু (সাহসী। কলজে থেকে)। খোপড়ি (মাথা, মাথার খুলি। হাঁড়িমাথা। ঘটে বুদ্ধি)। চোপা (মুখ। মুখরা—'গুপ্তিপাড়ার চোপা'। 'যত বড় মুখ নয়, তত বড় চোপা')। ঠোঁটপাতলা (যার পেটে কথা থাকে না)। ড্যানা (হাত। 'ড্যানা ধরে তোল')। নাকের বাঁশি (নাসারন্ধ্র)। ভাত হাত (ডান হাত)। পাতি (ছোট। পাতিহাঁস। পাতিলেবু। পাতিপুকুর)। পাবনি (পক্ষ্ম। চোখের পাতার লোম)। পুতলি (চোখের তারা বা মণি)। ফাপর (ফুসফুস। 'হাপর' 'হাঁফ' মনে করায়)। বুড়ো আঙুল চোষানো (ঠকানো)। ভাবুয়া (ভুরু)। মটক (চোখের পাতা)। হাড্ডি (হাড়। হাড্ডিসার)।

কথার হাতপা

কথায় কাজ হয় বলেই কথা নিয়ে প্রবাদ প্রবচনও বিস্তর।

কথার গুণে তরি। কথার দোষে মরি ॥ কথাতে হাতি পায় ॥ কথাতে হাতির পায় ॥ কথায় টলার চেয়ে পায়ে টলা ভালো ॥ কথার কথা কাজের নয় ॥ কথার নাম মধুবাণী। যদি কথা কইতে জানি ॥ কথার পেঁচাপেঁচি। কাজের আঁচাআঁচি ॥ কথার হাতপা বার করা ॥ আপন কথা পাঁচ কাহন। পরের কথা এক কাহন ॥ কাঙালের কথা বাসি হলে মিষ্টি হয় ॥ খড় পচে, খড়কে পচে। কথা পচে না ॥ ছোট মুখে বড় কথা ॥ যে কথা সেই কাজ ॥ স্পষ্ট কথায় কষ্ট নাই ॥ কথার ভট্‌চায্যি ॥ বেশি কথা কয় যে, কাজে কম হয় সে ॥ যার যা কথা নয়, সে কেন কথা কয় ॥

কিছু সাবেক শব্দ

কিছু সাবেক শব্দ আছে, আজও যা কাজে লাগানো যায়। যেমন:
আড়ং (গঞ্জ, গোলা; যেখানে ষাঁড়ের লড়াই হয়; ঘোড়দৌড়ের মাঠ। আড়ং ধোলাই— কোরা কাপড়ের রং আর মাড় ধুয়ে ফেলা)।
আয়াম (সময়, মরশুম; লিচুর আয়াম)।
খটি (পাইকারি বেচাকেনার হাট)।
গীতাল (গায়ক)।
জাঁকড় (পছন্দ না হলে কেনা জিনিস ফেরত নেওয়ার শর্ত)।
থাউকো (এক থোকে, সাপ্‌টা)।
ধুনকর (ধুনুরি)। পড়তা (খরচা)।
পাষাণভাঙা (ওজনে সমতা আনা)।
রোকড় (নগদ টাকায় কেনার হিসেব)।
আলকোটান (জেনেও যে না-জানার ভান করে)। আলিসান (মস্ত বড়)।
কারিন্দা (নিপুণ কারিগর)।
খুঁট আঁকুরে (যে পরছিদ্রান্বেষী)।
ঘর বসা (বেকার)। চৈতে কানা (চোত মাসের গনগনে রোদেও যে দেখতে পায় না; দেখেও না-দেখার ভান করে)।
ছালন চাকা (অস্থির মতি, কেবল এটা ছেড়ে ওটা করে)।
টগরা, টনকা (চালাক চতুর)।
কেতাবি বুলির চেয়ে লোকমুখের ভাষা ঢের বেশি কাজের হয়। যাতে কাজ হয়, সেই ভাষায় লিখলে সেটা হয় ধরাছোঁয়ার ভাষা। সোজা কথায়, সেটা হয় লেখার আকারে বলা।

আসাযাওয়া

বাংলায় কত শব্দ আছে, তা হলফ করে বলা শক্ত। কেননা শব্দের আসা-যাওয়ার বিরাম নেই। সমাজের হালচাল ক্রমাগত বদলে যাচ্ছে। পাল্টে যাচ্ছে কাজের ধারা। সেইসঙ্গে মানুষের চাওয়া-পাওয়ার ধরনও আর আগের মতো থাকছে না। সেকেলে অনেক কথাই অকেজো হয়ে যায়। 'কলের গান' তো উঠেই গেছে। নতুন নতুন যন্ত্র এসে পুরোনো যন্ত্রগুলোকে বাতিল করে দিয়ে ভাষায় যোগ করছে নিজেদের গড়ে-নেওয়া কিংবা পরের কাছ থেকে ধার-করা নিত্যনতুন শব্দ। কিংবা পুরোনো শব্দে যোগ হচ্ছে নতুন নতুন অর্থ।

আগে জলপথে গড়ে উঠত 'বন্দর'। পরে ক্রমান্বয়ে মালবাহী রেলপথ আর ট্রাক-লরির সড়কপথে পত্তন হল বন্দরের। যেখানে উড়োজাহাজ ওঠানামা করে, এখন তার নাম বিমানবন্দর। 'ইতর'-এর অর্থ ছিল: অন্য, অপর, অবশিষ্ট, বর্জিত। ক্রমে সঙ্কীর্ণ হয়ে তার অর্থ হয়েছে 'ছোটলোক'।
এমনইভাবে সমানে শব্দের এই ভাঙাগড়া, বাড়াকমা, অদলবদল চলতেই থাকে।
ক্ষেত্রবিশেষে কিছু ইতরবিশেষ থাকলেও মোটামুটি আটপৌরে চলতি কথাতেই আমাদের রোজকার কাজ চলে যায়।

কথার চোখকান

ভালো কইয়ে-বলিয়ে তারাই হয়, যারা চোখেকানে কথা বলে। কথাগুলো যেন চোখে দেখা যায়, কানে শোনা যায়। শব্দের মধ্যে থাকে হ্রস্বদীর্ঘ লঘুগুরুর আকার ইঙ্গিত। ইয়া বড়। এইটুকু। ফিনফিনে, ধুমসো।
জানা মানেই মুঠোয় আনা। যাতে আমরা ধরতে পারি। বাগে পাই।
যাতে পাওয়া যায়, যাতে মেলে, তার জন্যে আমরা একের সঙ্গে অন্যের মিল খুঁজি।
ভাষায় থাকে তাই উপমার ছড়াছড়ি। জানা জিনিসের সূত্র ধরে অজানাকে আয়ত্তে আনা হয়। সাধারণত 'মতো' বা 'যেন' দিয়ে আমরা সাদৃশ্য টানি। চাঁদের মতো মুখ। কখনও বা সরাসরি শব্দদুটোকে জুড়ে দিয়ে। চাঁদমুখ। এইরকম: দুধসাদা, ফুটিফাটা, বকধার্মিক, বিড়ালতপস্বী, কদমছাঁট, ফুলবাবু, হাঁড়িমুখ, মনমাঝি, ভবনদী, প্রতিবাদের ঝড়, চাঁদের হাট, অন্ধের যষ্টি।
দেখতে হবে তুলনাটা যেন আধাখেঁচড়া না হয়। তাতে যেন আগাগোড়া সঙ্গতি থাকে।

সওয়ার নয়, বাহন

ভাষা হল চিন্তার বাহন। উল্টে ভাষা যদি চিন্তার ঘাড়ে চেপে বসে, কথাগুলো তখন বেসামাল হয়ে পড়ে। তাতে কথারও জোর কমে।
যদি কেউ লেখে: 'এমন এক পাণ্ডববর্জিত দেশে এসে পড়ে মানুষের হট্টগোলে আমার ছেড়ে-দে-মা-কেঁদে-বাঁচি অবস্থা হল।' পাণ্ডববর্জিত হলে তো জনবিহীন হবে। এক মুখে দু কথা কেন?
কিংবা:

'একদিকে মোটা মাইনের হাতছানি, অন্যদিকে দেশসেবার মহান ব্রত— তার কাছে এ যেন এক শাঁখের করাত।' দোটানার ভাব আর উভয়সঙ্কট তো এক নয়।

চিন্তার মধ্যে ঢিলেভাব থাকলে কথাগুলোও তেমন দানা বাঁধে না।

যাকে আমরা সমার্থক শব্দ বলি, সেই প্রতিশব্দগুলোও সর্বতোভাবে এক নয়। কোনটা কোথায় লাগসই হবে, সেটা ঠিক করার ওপরই নির্ভর করে লেখকের হাতযশ।

নানা কাজে এককথা

একই শব্দকে আমরা নানা কাজে লাগাই। নিচে তার কিছু নমুনা দেওয়া হল—

মাথার চুল থেকে পায়ের নখ। সবকিছুই কাজে লাগে।

মাথা

মাথা পেতে নেওয়া (মানা)।

মাথা কেনা (অধিকার দাবি)। মাথায় তোলা (প্রশ্রয়)। মাথা খাওয়া (নষ্ট করা)। মাথা গলানো (হস্তক্ষেপ)। মাথা কাটা যাওয়া (মান খোয়ানো)। মাথা গোঁজা (আশ্রয়)। মাথা ঘামানো (চিন্তা)। মাথায় রাখা (মনে রাখা)। মাথায় ঢোকা (বোধগম্য হওয়া)।

মুখ

মুখ রাখা (মান রক্ষা)। মুখের ওপর (সামনা সামনি)। মুখের কথা (সহজ)। মুখের মতো (সমুচিত)। মুখে আনা (বলা)। মুখ তুলে চাওয়া (সদয় হওয়া)।

বুক

বুক ঠোকা (আস্ফালন)। বুক বাঁধা (মনের জোর)। বুক দিয়ে পড়া (কায়মনোবাক্যে সাহায্য)। বুকের পাটা (সাহস)। বুকে হাত দিয়ে বলা (দিব্য করা)।

হাত

হাত করা (স্বপক্ষে আনা)। হাত পাকানো (রপ্ত করা)। হাত কামড়ানো (আপসোস)। হাত পাতা (চাওয়া)। হাতে নেওয়া (দায়িত্ব নেওয়া)।

হাতধরা (বশ্য)। হাতভারী (কৃপণ)। একহাত নেওয়া (প্রতিশোধ)।

গা

গা করা, গা দেওয়া, গায়ে মাখা (আমল দেওয়া)। গা জ্বালা করা (বিরক্তি)। গা ঢেলে দেওয়া (এলিয়ে পড়া)। গা ঢাকা দেওয়া (গায়েব)। গায়ে পড়া (অযাচিত)। গা-সওয়া (অভ্যস্ত)।

চোখ

চোখ দেওয়া (লোভ করা)। চোখ টাটানো (ঈর্ষ্যা)। চোখ ফোটা (হুঁশ হওয়া)। চোখ রাঙানো (চোটপাট)। চোখের পরদা (লজ্জা শরম)। চোখ রাখা, চোখে চোখে রাখা (পাহারা)। চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো (নিঃসন্দেহ করা)।

কান

কান দেওয়া (গ্রাহ্য)। কান পাতা (শোনা)। কান ভারী করা (লাগানো)। কান-পাতলা (যে যাই বলে বিশ্বাস করা)। কান-কাটা (নির্লজ্জ)।

নাক

নাক গলানো (অনধিকার চর্চা)। নাক বরাবর (সোজা)। নাক তোলা, নাক সিঁটকানো (অবজ্ঞা, ঘৃণা)। নাকে খত দেওয়া (প্রায়শ্চিত্ত)।

পা

পায়ে পড়া, পায়ে ধরা, (আত্মসমর্পণ)। পায়ে ঠেলা (ত্যাগ)।
আঙুল। আঙুল ফুলে কলাগাছ (হঠাৎ ঐশ্বর্য)। বুড়ো আঙুল দেখানো (তাচ্ছিল্য)। তর্জনী তোলা (অভিযোগ)।

নখ

নখাগ্রে, নখের আগায়, নখদর্পণে (স্পষ্ট জ্ঞান)। নখের যুগ্যি নয় (তুলনা হয় না)।

মন

মন করা (সঙ্কল্প)। মন দেওয়া (মনোনিবেশ)। মন পাওয়া, মন গলা (তুষ্টি)। মন কেমন করা (উতলা)। মন-মরা (বিষণ্ণ)। মনের মতন, মনে ধরা (পছন্দ)। মন দেওয়া-নেওয়া (ভালোবাসা)।

গুণবাচক

বড়: বড় হওয়া (বৃদ্ধি)। বড় কুটুম (শালা)। বড় জোর (খুব বেশি হলে)।
ছোট: ছোট নজর (সঙ্কীর্ণ)। ছোট কাজ (হেয়)। ছোট মুখে বড় কথা (স্পর্ধা)।

ছোটলোক (হীন)। ছোট করা (অবজ্ঞা)।

কাঁচা: কাঁচা বয়স, কাঁচা বুদ্ধি, কাঁচা হাত (অপরিণত)। কাঁচা কাজ, কাঁচা লেখা (অপটু)। কাঁচা রাস্তা (মাটির)। কাঁচামাল (উপাদান)। কাঁচা পয়সা (সহজলভ্য)। কেঁচে যাওয়া (পণ্ড হওয়া)। কেঁচে গণ্ডুষ (ফিরে আরম্ভ করা)।

পাকা: পাকা মাথা (অভিজ্ঞ)। পাকা কাজ (স্থায়ী)। পাকা হাত (নিপুণ)। পাকা কথা (চূড়ান্ত)। পাকা-পাকা কথা (জ্যাঠামি)। পাকাপাকি (নিশ্চিত)।

নানা কাজে এক ক্রিয়া

একই ক্রিয়া বিস্তর কাজে লাগে। যেমন:

লাগা

ভালো লাগা (পছন্দ)। সময় লাগা (দেরি)। টাকা লাগা (খরচ)। কাজে লাগা (ব্যবহার)। মনে লাগা (ক্ষুণ্ণ)। পিছনে লাগা (শত্রুতা)। লেগে পড়া (যোগ দেওয়া)। উঠে পড়ে লাগা (উদ্যোগী হওয়া)।

ধরা

ট্রেন ধরা (ওঠা)। এ স্টেশনে ট্রেন ধরে না (দাঁড়ায় না)। বৃষ্টি ধরেছে (থেমেছে)। ধরে যাওয়া (পোড়া)। দোর ধরা, মুরুব্বি ধরা (প্রত্যাশা)। গলা ধরা (গলা বসে যাওয়া)। ধরকাট (নিয়ম মানা)। মনে ধরা (মনোমতো)। বেশ ধরা (সাজা)। হাতধরা (অনুগত)। ম্যাও ধরা (দায়িত্ব নেওয়া)।

কাটা

সময় কাটা। সুর কাটা। তাল কাটা। টিকিট কাটা। বাজারে কাটা (বিক্রি)। দাগ কাটা। মনে দাগ কাটা (মনে থেকে যাওয়া)। কেটে পড়া (পালানো)। কাটিয়ে ওঠা (নিস্তার)। পকেট কাটা। কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে (মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা)।

ওঠা

সকালে ওঠা। গাছে ওঠা। ঘরে ওঠা। বাজারে ওঠা। জাতে ওঠা (মর্যাদা)। দাঁত ওঠা। চুল ওঠা। ক্লাসে ওঠা। পাখা ওঠা (স্পর্ধা)। ভাড়াটে ওঠা। উঠে যাওয়া। উঠে পড়া। উঠ কিস্তি (বড়ে ওঠালেই কিস্তি পড়া)। উঠবন্দী (চাষের খেতে মেয়াদী বন্দোবস্ত)।

তোলা

শিকেয় তোলা (স্থগিত)। মাথায় তোলা (আশকারা)। বাড়ি তোলা। কানে

তোলা। গাছে তোলা (প্রশংসা)। গান তোলা (শেখা)। কথা তোলা (প্রসঙ্গ ওঠানো)। রব তোলা (প্রচার)। তোলাপাড়া (বার বার ভাবা)। তোলপাড় (ওলটপালট)। তুলকালাম (হুলুস্থুল)।

মুখের কথা

লেখার কাজে লাগানো যায় এমন কিছু লোকমুখের কথা:

ডোকলা (অপব্যয়ী)। ট্যাটা। হিজলদাগড়া (বেহায়া)। টিট (জব্দ)। ঢ্যাঙা (লম্বা)। ড্যাকরা (শঠ)। ত্যাঁদড় (শয়তান)। দজ্জাল (ঝগড়াটে)। দুম্বো, ধুম্বো (বড়সড়)। ধুমসো (মোটা)। নিকড়ে (নিষ্কপর্দক)। নিড়বিড়ে (চটপটে নয়)। পাটোয়ার (অতি হিসেবী)। ফটিকচাঁদ (ফুটফুটে চেহারার লোক)। ফতো (অন্তঃসার শূন্য)। ফিচেল (ফন্দিবাজ)। ফুটানি (বড়লোকি চাল)। বইতাল (মিথ্যেকে সত্যি আর সত্যিকে যে মিথ্যে বলে চালায়)। মড়ুঞ্চে (যে স্ত্রীর বাচ্চা বাঁচে না)। মাওরা (মা-মরা)। ম্যান্‌তামুখো (মিনমিনে)। জোগাড়ে (জুটিয়ে নিতে পারে)। জোগালে (রাজমিস্ত্রির জন)। সাউকুরি (অন্যের পক্ষে ওকালতি)। হাউড়ে (পেটুক)। হারুন (দুষ্টু)। হেক্কট (অবাধ্য)। হাত নুড়কুত (যে ফাইফরমাশ খাটে)।

সাঁট ইশারা

লিখতে গিয়ে আমরা বাক্য শেষ করে দাঁড়ি টানি। শুরুতে, মাঝখানে, উপান্তে আর অন্তে থাকে প্রয়োজনমতো উদ্ধৃতি, বন্ধনী, কমা, সেমিকোলন, কোলন, হাইফেন, ড্যাশ, ফুটকি— এই রকমের হরেক চিহ্ন। পাঠক যাতে বাক্যটিতে অর্থের দিশা পায়।

যতিচিহ্ন

কমা ,

বাক্যের মধ্যে কম সময় থামলে হয় কমা। নানাভাবে কমার ব্যবহার হয়: (১) সমজাতীয় বিভিন্ন পদ (বিশেষ্য, সর্বনাম, বিশেষণ, অব্যয়, ক্রিয়া) পর পর থাকলে। স্নানঘরে তেল, সাবান, তোয়ালে, শ্যাম্পু সবই মজুত। আপনি, আমি, উনি সবাই এক গোত্রের। লোকটি মোটাসোটা, বেঁটে, মাঝবয়সী। তবে, যদি, কিন্তু এসব শুনতে চাই না। তোমার সঙ্গে আমার দেওয়া, নেওয়া, পাওয়ার সম্পর্ক নয়। (২) পর পর একাধিক অসমাপিকা ক্রিয়া থাকলে:

সকালে একজন ঘর ঝাঁট দিয়ে, বাসন মেজে, উনুন ধরিয়ে চলে যায়। (৩) পাশাপাশি একাধিক বাক্য বা বাক্যাংশ থাকলে কমা দিয়ে আলাদা করা দরকার। আমি আসরে বসলাম, কিছুক্ষণ গান শুনলাম, দশটায় উঠে চলে এলাম। (৪) বাক্যের গোড়ায় প্রথমত, অর্থাৎ, প্রকৃতপক্ষে, হ্যাঁ, না ইত্যাদির পর। প্রথমত, কী ঘটেছে দেখতে হবে। (৫) পরের বাক্যের তাহলে, কিন্তু ইত্যাদির আগে। তুমি যদি ওষুধ না খাও, তাহলে অসুখ সারবে না। (৬) বাক্যের গোড়ায় ক্রিয়াবিশেষণের পর। বরাত ভালো, ঠিক সেই সময় বৃষ্টি এল। (৭) উদ্ধৃতিচিহ্নের আগে। সে বলল, 'চললাম'। (৮) সম্বোধনপদের পরে। মা, আমি এসেছি। (৯) নামের শেষে পরিচয় চিহ্নের আগে। অমিয় দেব, প্রাক্তন উপাচার্য। (১০) সংযোজক (এবং) বা বিয়োজক (কিংবা) পদের আগে কমা হবে না। এখানে সস্তায় আহার এবং বাসস্থান মিলবে। ফাঁকা ট্রেনে যেতে পারেন অথবা ভিড়ের বাসও ধরতে পারেন।

সেমিকোলন ;

কমার চেয়ে একটু বেশি থামতে হলে। (১) জটিল বাক্যের মাঝখানে। মানুষটি ছিলেন নির্লোভ, প্রচারবিমুখ; এবং পরিচিত সকলেরই ছিলেন শ্রদ্ধার পাত্র। (২) ভাবগত মিল আছে, এমন পাশাপাশি বাক্যের মধ্যে। আজ যার এত কদর, কাল কেউ তাকে পুঁছবে না; এটাই জগতের নিয়ম।

কোলন :

(১) উদ্ধৃতির আগে। তাঁর কথা: 'যত মত তত পথ'। (২) দৃষ্টান্ত দেখাতে। এই যেমন: গান গাওয়া, ছবি আঁকা, পদ্য লেখা। (৩) দুই পৃথক বাক্যের ভাবগত অন্তর্মিল থাকলে। পড়লে চিন্তাশক্তি বাড়ে: বই হল ভাবনার খোরাক।

প্রশ্নচিহ্ন ?

যেখানে প্রশ্ন থাকে, সেখানে বাক্যের শেষে। তোমার কী নাম?

বিস্ময় চিহ্ন !

বিস্ময়, ঘৃণা, শোক, আনন্দ প্রকাশের ক্ষেত্রে। কী সুন্দর! তোমাকে ধিক!

ড্যাশ —

(১) হঠাৎ থামলে কিংবা চিন্তা অন্য দিকে মোড় নিলে। কী বলছিলাম— হ্যাঁ, মনে পড়েছে। লটারিতে টাকা পেলে— যতসব উদ্ভট চিন্তা। (২) বক্তব্যকে বিশদ করতে। ওঁর আর সেদিন নেই— ক্ষমতায় এসে গাড়ি, বাড়ি, টাকা সবই হাতের মুঠোয়।

হাইফেন -

পদ জোড়া দেওয়ার চিহ্ন। শ্রমিক-কৃষক। কাঠ-ফাটা। ভাত-রুটি। নুন-তেল-লকড়ি।

কোট-চিহ্ন " ", ' '

অন্যের কথা উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে দেওয়া হয়। চণ্ডীদাস গেয়েছেন: "সবার উপরে মানুষ সত্য"। কখনও কোনও প্রসঙ্গ, বইয়ের নাম ইত্যাদিও কোট চিহ্নের অন্তর্গত করা হয়। অন্নদাশঙ্করের 'পথে প্রবাসে'। সেদিনের সেই 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন।

ছাড় চিহ্ন ...

না-বলা কথা বোঝাতে। তখন সে যে ভাষায় বলল, তা লেখা যায় না...। স্থানকালের ব্যবধান বোঝাতে। দিন যায়... মাস যায়... বছর যায়...। আজ দিল্লি... কাল লন্ডন... পরশু নিউইয়র্ক।

উর্ধ্ব-কমা ,

উচ্চারণে ও-কার কিংবা লোপ চিহ্ন হিসেবে। তুমি ওঁর বইটা প'ড়ো। ক'টা বাজল? ন'টা?

বন্ধনী ( )

বন্ধনী ব্যবহার করা হয় বাড়তি খবর বা প্রমাণপঞ্জীর উল্লেখের জন্যে। রাজনীতি আর দুর্নীতির আজ পিঠোপিঠি সম্পর্ক (তহলকা)। শ্রীলঙ্কায় ভারত গো-হারা (বিস্তৃত খবর, পৃষ্ঠা ১৩)।

ব্যক্তিবিশেষের অভিরুচিতে এসব চিহ্নের নানা রকমফের হয়। চোখ খুলে তাকালেই নানা জনের লেখায় তার নমুনা মিলবে।

এই প্রসঙ্গে দুটো জরুরি কথা মনে রাখা দরকার। পাঠক যাতে লেখকের বলবার কথা সহজে ধরতে পারেন, যতিচিহ্ন তার সহায়ক।

ছোট ছোট বাক্যে কমা সেমিকোলনের আধিক্য কমানো যায়। পড়ে বুঝতে খুব একটা অসুবিধে হয় না।

যতিচিহ্ন মানেই, বাক্যে কমবেশি ছেদ আনা। বেশি ছেদচিহ্ন থাকলে পড়ায় অনেক সময় ব্যাঘাত ঘটে।

অব্যয়

কথায় কথায় চলে এসেছি অনেক দুর।
পাততাড়ি গোটানোর আগে পিছনে তাকিয়ে মনে হচ্ছে, অনেক কিছু না-বলা থেকে গেল। কেননা অনেক কিছুই আমার নাগালের বাইরে।
বাংলাভাষায় যে পদটির কোনও বিকার নেই, সেটি হল অব্যয়। নির্বিকার হয়েও অব্যয়ের গুণ অনেক। পদ আর বাক্যের মধ্যে হয় সম্বন্ধ ঘটায়, নয় বাক্যের মধ্যে থেকেও নিজেকে আলাদা করে রাখে।

পদান্বয়ী অব্যয়

যেমন: তুমি ওর কাছে থাকো। সঙ্গে, ছাড়া, বিনা, সুদ্ধ, ভেতর, বাইরে, পিছুন, সামনে, পাশে ওপরে, জন্যে, চেয়ে— এইরকমের বিস্তর অব্যয় আছে। বাক্যের মধ্যে নামপদের লেজুড় হয়ে বসে ক্রিয়াকে স্থান কাল পাত্র আর প্রকার বিষয়ে হদিশ দেয়।

বাক্যান্বয়ী অব্যয়

এইসব অব্যয় একাধিক বাক্যকে হয় একত্র, নয় পৃথক করে। ও, আর, এবং; বা, অথবা, কিংবা; তবু, কিন্তু, বরং; কারণ, কেননা, সেজন্যে, তাই বলে; যদি-তবে, যেমন-তেমনই, যে-সে, হয়-নয়; তাই, সুতরাং; সবে, হঠাৎ, তৎক্ষণাৎ; না হলে, নইলে, নয়তো। এইসব অব্যয়ে জোড়াতোড়া আর ঠেকো দেওয়ার কাজ হয়। সকাল সকাল যাব আর বেলাবেলি চলে আসব। তুমি বইটা পাঠিয়ে দিও কিংবা আমিই আনাবার ব্যবস্থা করব। কাল বাজার হবে না; কারণ, ওরা কাল বন্‌ধ ডেকেছে। যদি ছাতা থাকত, তবে এভাবে ভিজতে হত না। হয় এস্পার, নয় ওস্পার।
আর আছে নানান ভাব প্রকাশের অব্যয়। অ্যাঁ, বটে, ইস্, সত্যি; বাঃ, বেশ, খাসা; ছি, ছ্যা, ধিক; আচ্ছা, আলবৎ, আজ্ঞে, হ্যাঁ; না, আজ্ঞে না, উঁহু; ওরে, ওহে, ধ্যুস্, ধুত্তোর, ছাড়ো তো; হায় হায়, সর্বনাশ; কী, কি, কবে, কেন; মতো, যেন, যেমন: যে, না, বা; বিস্ময়, প্রশংসা, নিন্দা, সায়, অস্বীকার, ডাক, বিরক্তি, শোক, জিজ্ঞাসা, তুলনা— মনের যাবতীয় ভাব এইসব অব্যয় দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়। যেমন: এ কথা সে বলতে পারল, অ্যাঁ! আ মরি, বাংলা ভাষা। কে এখানে থুথু ফেলল, ছি! যা বলেছ, একেবারে খাঁটি কথা। দুর, এ

আমি বলতেই পারি না। ওহে, এদিকে একবার তাকাও। কী জ্বালা, গেল কোথায় লোকগুলো? হায় রে, ওর আর আপন বলতে কেউ রইল না। কী বলো, আমি তাহলে বাক্সপ্যাঁটরা গুছিয়ে নিই? আহা, তখন নেতারা কী সব দেবতুল্য মানুষ ছিলেন।

আদিমকালের মানুষ প্রকৃতিকে আত্মস্থ করে শুরু করেছিল প্রকৃতিকে বশে আনার চেষ্টা। এই জাদু করার চেষ্টা থেকেই একদিকে ধর্মের, অন্যদিকে বিজ্ঞানের উদ্ভব।

অনুকার শব্দ

বাংলা ভাষায় এত যে অনুকার শব্দের ছড়াছড়ি, তারও কারণ, কথার জাদু দিয়ে মনস্কামনা পূর্ণ করা।

ভাষার কাজই হল কানে শুনিয়ে মনশ্চক্ষে ছবি ফোটানো। এ কাজে নকলনবিশ অব্যয়ের জুড়ি নেই। তার কিছু নজির দিয়ে এবার এই আসরের পাট ওঠাব।

কিচির মিচির, কুট কুট, কল কল, খুট খাট, খচ খচ, খল বল, গজ গজ, গল গল, গুম গুম, ঘড় ঘড়, ঘিন ঘিন, ঘুর ঘুর। চোঁ চোঁ, চিন চিন, চক চক, ছোঁক ছোঁক, ছম ছম, ছ্যাঁক ছ্যাঁক, জ্বল জ্বল, জব জব, জুল জুল, ঝম ঝম, ঝাঁ ঝাঁ, ঝটপট। টিম টিম, টস টস, টুপ টাপ, ঠুং ঠাং, ঠক ঠক, ঠা ঠা, ড্যাব ড্যাব, ডিগ ডিগ, ড্যাডাং ড্যাং, ঢুলু ঢুলু, ঢক ঢক, ঢল ঢল। তর তর, তুল তুল, তিড়িং বিড়িং, থল থল, থিক থিক, থই থই, দপ দপ, দুড় দাড়, দমাদম, ধক ধক, ধুপ ধাপ, ধুক ধুক, নড় বড়, নিস্‌পিস, নট খট। পিট পিট, প্যাঁ পোঁ, পটাপট, ফিস ফিস, ফোঁস ফোঁস, ফ্যাল ফ্যাল, বক বক, বিড় বিড়, ব্যা ব্যা, ভুট ভাট, ভোঁ ভাঁ, ভন ভন; ম' ম', ম্যাজ ম্যাজ, মিন মিন। রী রী, রে রে, রই রই, লী লী, লিক লিক, লটর পটর, শোঁ শোঁ, শন শন, শুনশান, সির সির, সপাং, সুড় সুড়, হাহা হিহি, হিড় হিড়, হাপুস হুপুস।

নিখরচায় ফরমাশ খাটে যে অব্যয় পদ, তার খুরে খুরে দণ্ডবৎ হয়ে এখানেই দাঁড়ি টানি।

বানানের হালফিল

বানান বলতে অক্ষর দিয়ে শব্দ বানানো। শুনতে সহজ, লিখতে গিয়েই ধন্ধে পড়তে হয়। ইকার, ঈকার, উকার, ঊকার। ণ, ন। শ, ষ, স। ং, ঙ। এমনই নানা ঝুট-ঝামেলা। সেকালের বাংলা যে বানানে লেখা হত, আজ তা অচল। তাছাড়া আমাদের বলা আর লেখায় প্রচুর গরমিল।

সবদিক রক্ষা হয় যদি হাতের কাছে থাকে 'আকাদেমি বাংলা অভিধান'। সেইসঙ্গে দরকার হালফিল বানানের কিছু নিয়মকানুন জেনে রাখা।

তৎসম শব্দের বানান খুব একটা পাল্টায়নি। অন্যান্য শব্দের ক্ষেত্রে বানানে একটা সামঞ্জস্য আনার চেষ্টা হয়েছে।

কিছু কিছু নিয়ম মনে রাখলে বানান ভুলের হাত থেকে কিছুটা রেহাই মিলবে।

ণ-ত্ব

সংস্কৃত তৎসম শব্দে **কোথায় ণ হবে:** (১) ঋ, র, ষ-র পর ণ হবে। ঋণ, তৃণ, রণ, দূষণ। (২) দুইয়ের মাঝখানে স্বরবর্ণ, ক-বর্গ, প-বর্গ, য, ব, হ থাকলেও ণ হবে। দ্রোণ, কৃপণ, রাবণ, অর্হণ। কিন্তু চ, ট, ত বর্গের ক্ষেত্রে ণ হয় না। রচনা, রটনা, নর্তন, প্রার্থনা। (৩) সমাস পদে ণত্ববিধি খাটবে না। সর্বনাম, দুর্নাম, দুর্নীতি, বরনারী। (৪) ট-বর্গের আগের ন হবে ণ। কণ্টক, কুণ্ঠা। (৫) প্র, পরা, নির্, পরি উপসর্গযুক্ত নম্। নশ্, নী, নু, অনু, হন্ ইত্যাদি ধাতুর ন হয়ে যায় ণ। প্রণাম, পরিণয়, প্রাণ, প্রণয়, নির্ণয়। (৬) প্র, পরি উপসর্গের পর নি উপসর্গ ণি হয়। প্রণিপাত, প্রণিধান। (৭) কিছু সমাস পদেও ণ হয়। নারায়ণ, অগ্রহায়ণ, পূর্বাহ্ণ, অপরাহ্ণ। (৮) ত, থ, দ, ধ-র আগে ন হয়। নন্দন, সন্তান, মন্থন, গন্ধ। (৯) পদের শেষে ণ্ হয় না। শ্রীমান, ব্রহ্মন্। (১০) কিছু শব্দে সব সময় ণ হয়। অণু, বাণী, গৌণ, কোণ, কণা, গুণ, তূণ, কল্যাণ, ফণা, বাণ, পুণ্য, স্থাণু, পণ্য।

ষ-ত্ব

কোথায় ষ হবে: (১) ঋ-র পর। ঋষি, বৃষ, কৃষি। (২) অ, আ ভিন্ন অন্য স্বরবর্ণ বা স্বরধ্বনির পর ক বা র থাকলে প্রত্যয় বা বিভক্তির স হয় ষ। বিষম, সুষুপ্ত, পরিষ্কার, ভবিষ্যৎ, আবিষ্কার, মুমূর্ষু। (৩) অ বা আ থাকলে হবে না: ভাস্কর, পুরস্কার, তিরস্কার, কল্যাণীয়াসু (এ-থাকায় হবে কল্যাণীয়েষু)। (৪) ই বা উ-কারান্ত উপসর্গের পর সদ্, সন্জ্, সিচ্, সিধ্, স্থা ধাতুর স হয় ষ।

বিষণ্ণ, উপনিষদ, অনুষঙ্গ, নিষিক্ত, অভিষেক, নিষেধ, প্রতিষেধক, প্রতিষ্ঠা, অনুষ্ঠান। (৫) ট বা ঠ-র সঙ্গে যুক্ত শিস্-ধ্বনি ষ হয়। কষ্ট, দুষ্ট, স্পষ্ট, কাষ্ঠ, নিষ্ঠুর, সুষ্ঠু। (৬) কিছু শব্দে সব সময়ই ষ হয়। ষণ্ড, পাষণ্ড, আষাঢ়, বাষ্প। কেবল সংস্কৃত তৎসম শব্দে এই ণত্ব আর ষত্ববিধির প্রয়োগ হয়।

বিসর্গ

কিছু ক্ষেত্রে মাঝের বিসর্গ ছাড়া পদান্তে বিসর্গের প্রয়োজন নেই। যেমন: প্রথমত, প্রায়শ, ক্রমশ, ইতস্তত।

কিছু ক্ষেত্রে মাঝের বিসর্গ থাকছে: যেমন: মনঃপূত, মনঃসংযোগ, স্বতঃসিদ্ধ, নিঃস্বার্থ, নিঃশেষ।

অনুস্বর

সংস্কৃত শব্দে ং বা ঙ দুটোই শুদ্ধ হলে কেবল ং-কেই বেছে নিতে হবে। অলংকার, অহংকার, সংগীত, সংগতি, সংকেত, সংঘ।

কিছু ক্ষেত্রে স্ব হবে। যেমন: সম্বন্ধ, সম্বল, সম্বিৎ, সম্বোধন।

কিন্তু প্রিয়ম্বদা নয়। হবে প্রিয়ংবদা।

তালব্য শ

যেখানে সংস্কৃত তৎসম শব্দে শ-র বিকল্পে ষ বা স আছে, সেখানে শ-কেই বেছে নিতে হবে। যেমন: কিশলয়, শায়ক। কিন্তু, বহু প্রচলিত 'সরণি'কে 'শরণি' করা কি ঠিক হবে?

ই-কার ঈ-কার

ই-কার ঈ-কার: অ-তৎসম শব্দে সাধারণভাবে ই-কার। দিঘি, নিচু, হাতি, হিরে, বাড়ি, বাঁশি।

স্ত্রীবাচক শব্দেও ই-কার। খুড়ি, জেঠি, মাসি, বাঘিনি, বামনি।

জীবিকা ভাষা গোষ্ঠী সম্প্রদায় জাতি বোঝাতে ই-কার। ওকালতি, ডাক্তারি, ইংরিজি, জাপানি, দেহাতি, ইহুদি। কিন্তু ইউরোপীয়, এশীয়, ইতালীয়, মালয়েশীয়।

উ-কার ঊ-কার:

উ-কার ঊ-কার: অ-তৎসম শব্দে উ-কার। পুব উনিশ পুজো ধুলো।

কিছু শব্দে ক্ষ-র বদলে খ। খুদ, খেত, খ্যাপা।
ঙ ঙ: রাঙা ডাঙা কাঙাল লাঙল নোঙর ধাঙড়। কিন্তু জঙ্গল জঙ্গি লুঙ্গি হাঙ্গামা দাঙ্গা।

শব্দান্তে ও-কার

শব্দান্তে ও-কার। কালো ছোটো বড়ো ভালো মতো এগারো বারো হয়তো।
কিন্তু: এত তত কত যত।
কোন্, কোনও: কোন্ বই দেব? যে কোনও একটা বই দাও। কোন্ কোন্।
কোনও কোনও।
কখনও তখনও।
কারও আরও।
আজও এখনও তোমারও আমারও।
জল থেকে জোলো। টোল থেকে টুলো। হার থেকে হেরো।
লো। ছুঁচলো জোরালো ধারালো প্যাঁচালো।
ক্রিয়ার ক্ষেত্রেও আছে সমতা আনার কিছু বিধান।

অগতির গতি অভিধান

বানানের অনেকটাই অভ্যেসের ব্যাপার। নতুন রীতিতে রপ্ত হতে সময় লাগে। লিখতে গিয়ে খটকা লাগলে অভিধান দেখা ছাড়া উপায় নেই।
নতুন জুতোয় পায়ে ফোস্কা পড়ার ব্যাপারটা এড়ানো যাবে না।
তাছাড়া চোখ-সওয়ানোরও ব্যাপার আছে।
বানানের ব্যাপারে সব লেখকেরই নিজস্ব কিছু রুচি থাকে। দীর্ঘদিনের অভ্যেসে শব্দের বিশেষ লেখ্যরূপটি চোখ-ছাড়া করতে মন চায় না।
কাজেই, কিছু ইতরবিশেষ হবে এটা ধরে নিয়েই বাংলা বানানে যথাসম্ভব একটা সমতা আনতেই হবে।
যার মন খুঁতখুঁত করবে, তাকে এই কথার মধ্যে সান্ত্বনা খুঁজতে হবে যে, 'আপ রুচি খানা, পর রুচি পর্‌না'।
'পর্‌না', না 'পড়না'?

আমার কথাটি ফুরুলো।